পুণ্যবতী নারী

তাপসী ও ছোটদের গল্পের লেখক

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত

প্রণীত

মূল্য ৶০ আনা।

Printed by
KARTIK CHANDRA BOSE
for
U. RAY & SONS, PRINTERS
100, Gurpar Road, Calcutta.

নিবেদন

এই পুস্তকে একটি উচ্চ শিক্ষিতা এবং নব্যতন্ত্রের দুইটি ধর্ম্মশীলা নারীর জীবনচরিত মুদ্রিত করা গেল। পাঠকগণ বইখানি পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিলেই আমার পরিশ্রম সার্থক মনে হইবে।

শ্রদ্ধাস্পদ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাস মহাশয়ের সময়ের অভাবসত্ত্বেও তিনি এই পুস্তকের প্রথম জীবন-চরিতের পাণ্ডুলিপি দেখিয়া দিয়াছেন এবং আমার পরম শ্রদ্ধার পাত্রী কবি কামিনী রায় বি-এ, উক্ত জীবনচরিত সম্বন্ধে একখানি চিত্তাকর্ষক চিঠি লিখিয়া উহা এই গ্রন্থে প্রকাশের অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদিগের নিকট অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৩
গিরিডি

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত

সূচী

অভিমত

সুপ্রভাত মাসিক পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা কুমুদিনী সরস্বতী বি-এ, পুণ্যবতী নারীর ফাইলগুলি পড়িয়া লিখিয়াছেন—

" * * শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত মহাশয় তিনটি পুণ্যশীলা নারীর জীবনী লিখিয়া নারীজাতির মহদুপকার সাধন করিলেন। তিনি অতি মধুর ভাষায় এরূপ চিত্তাকর্ষক করিয়া এই জীবনীগুলি লিখিয়াছেন যে একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া বইখানি রাখা যায় না। পড়িতে পড়িতে * * হৃদয় মহৎ ভাবে আপ্লুত হয়।

* * * *

"লোকে বলে উচ্চ জ্ঞান না থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণা আতরমণি দেবীর জীবনী, সে ধারণা যে অসার তাহা প্রতিপন্ন করিতেছে। তাঁহার উচ্চ শিক্ষা ছিল না; দশ জনের মত সংসার করিতেন, ধনের দ্বারা বেষ্টিত ছিলেন, কিন্তু প্রাণটি ঈশ্বরের সঙ্গ লাভের জন্য কী আকুল ছিল, ধর্ম্মসাধনার প্রতি কী নিষ্ঠা, কী অনুরাগ ছিল!

"পুণ্যবতী অন্নপূর্ণা দেবী ধর্ম্মপ্রাণতা, তেজস্বিতা ও মানব-সেবায় আদর্শ নারী ছিলেন। তিনি ৬৭ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন এ দেশের নারীদের মধ্যে জ্ঞানের প্রসার কত অল্প ছিল। কিন্তু তাঁহার জ্ঞানলাভের জন্য অপূর্ব্ব আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। তিনি নিজের চেষ্টায় প্রভূত জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি শুধু জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, সেই জ্ঞান মানব-সেবায় নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার বৈরাগ্য, তাঁহার পরসেবা, সমগ্র নারীজাতির স্পৃহণীয়। ভগবান্ করুন এই সব ধর্ম্মপ্রাণা নারীর জীবনী আমাদিগের চিত্তকে পার্থিব রাজ্য হইতে অপার্থিব রাজ্যের দিকে লইতে সমর্থ হউক।

৬নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা,
৬ই আশ্বিন, ১৩৩০

শ্রীকুমুদিনী বসু

উৎসর্গ

কল্যাণীয়া

শ্রীমতী ফুল্লনলিনী রায়চৌধুরী ও

পরলোকবাসিনী চারুনলিনী দেবী

কল্যাণীয়াসু

এই গ্রন্থের প্রথম জীবনচরিতটি যখন রচনা করিয়াছিলাম, তখন তোমাদের অল্প বয়স; তখন জীবনচরিত পড়িবার জন্য মনে কতই আগ্রহ! তাই আমার হাতের লেখা খাতাখানি পড়িয়াই তোমরা অত্যন্ত খুসী হইয়াছিলে! আজ সেই কথা স্মরণ করিয়া—স্নেহের ফুল্ল, এই বইখানি তোমাকে উপহার দিলাম এবং চারুর আত্মার উদ্দেশে উৎসর্গ করিলাম।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীঅ—



সরলা দেবী

পুণ্যবতী নারী

সরলা দেবী

১

আমাদের এই বাংলা দেশে উচ্চশিক্ষিতা ও উপাধিধারিণী মহিলার সংখ্যা অতি অল্প। কিন্তু এই অল্পসংখ্যক মহিলার মধ্য হইতেই একটি তরুণী নারী সংসারের নিকট চির-বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সবে মাত্র তেইশ বৎসর ছয় মাস এই পৃথিবীতে বাস করিয়াছিলেন। সেই কয়েক বৎসরের অধিকাংশ সময় তাঁহাকে স্কুল ও কলেজের ছাত্রীরূপে বোর্ডিংয়ে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতে হইয়াছে। এজন্য আত্মীয়-স্বজন ও বিশেষ পরিচিত বন্ধু ভিন্ন আর কেহই তাঁহার মহত্ত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হন নাই। এই বিদুষী নারীর জীবন-পুষ্প বর্ণে, গন্ধে ও সুষমায় বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল; কিন্তু সে দৃশ্য অনেকেরই চোখে পড়ে নাই। ধনীর অট্টালিকায় টবের মধ্যে সুন্দর গাছটিতে সুন্দর ফুল ফুটিয়া উঠে; শুধু ঘরের লোকেরাই তাহার সৌন্দর্য্যটুকু দেখিতে পায় ও সুঘ্রাণে আকৃষ্ট হয়, তাহার পরে সে ফুল ঝরিয়া পড়ে, মৃত্তিকায় মিলাইয়া মিশাইয়া যায়। তেমনি এই ধনীর কন্যা, ধনীর গৃহে পুষ্পের মত প্রস্ফুটিত হইলেন, জীবনের সৌন্দর্য্যে ও সৌরভে আত্মীয়-স্বজনকে

মুগ্ধ, প্রিয়জনকে সুখী এবং স্বামীকে সংসারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ দান করিলেন ; অবশেষে এই সুন্দর পুষ্প সংসারবৃন্ত হইতে ঝরিয়া পড়িল। বাহিরের লোকেরা এই পবিত্র কুসুমের শোভাও দেখেন নাই, সুগন্ধেও আকৃষ্ট হন নাই। তবুও সরলা বাংলা দেশের একটি উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা বলিয়া, তাঁহার অল্পকাল স্থায়ী জীবনের অসম্পূর্ণ কাহিনীই বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

সরলা রেঙ্গুণের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যা। তাঁহার নিবাস চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামেই সরলার জন্ম হইয়াছিল। সরলার বয়স যখন সবে ছয় মাস, তখন তাঁহার মা তাঁহাকে লইয়া রেঙ্গুণে গমন করিয়াছিলেন। সরলা পাঁচ বৎসর বয়সের সময় রেঙ্গুণের মেথডিষ্ট্ স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া পড়াশুনা করিতে প্রবৃত্ত হন। চারি বৎসর পরেই তিনি প্রাইমারি পরীক্ষায় পাশ করিয়া রেঙ্গুণ বিভাগের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন এবং মাসিক আট টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন।

এই সময়ে সরলার পিতা কন্যার বুদ্ধি ও বিদ্যানুরাগ দেখিয়া, তাঁহাকে কলিকাতায় বেথুন-বোর্ডিংয়ে পাঠাইয়া উচ্চ শিক্ষা দিতে অভিলাষ করেন। কিন্তু কন্‌ভেণ্টের অধীনস্থ স্কুলের শিক্ষয়িত্রীগণ সরলার সরলতায়, সরলার সদ্‌গুণে, সরলার নম্র ব্যবহারে বড়ই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাই তাঁহারা স্কুলের প্রিয় ছাত্রীকে কিছুতেই ছাড়িতে চাহিলেন না ; সরলাকে তাঁহাদের কাছে রাখিবার জন্যই তাঁহার পিতাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন। সরলার পিতা সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি কন্যার এগার বৎসর বয়সের সময়ে তাঁহাকে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন এবং তাঁহাকে বেথুন স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

সরলার তের বৎসর বয়সের সময়ে আমাদের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হয়। আমরা দার্জ্জিলিঙ্গে কিছুদিন তাঁহাদের সঙ্গে এক বাড়ীতেই বাস

করিয়াছিলাম। তখন সরলার সরলতা ও হাসিখুসী ভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে ছোট একটি বালিকা বলিয়া মনে হইত। সরলা সময় সময় এমন ছেলে মানুষের মত প্রশ্ন করিতেন, শুনিয়া অবাক্ হইয়া যাইতাম!

সরলার এই রকম সরলতার হয় ত একটি কারণ ছিল। তিনি খুব অল্প বয়সে রেঙ্গুণে থাকিতেন, কন্‌ভেণ্টে ইংরাজ মহিলাদিগের কাছে পড়িতেন; তাঁহার পিতাও বিলাত-প্রত্যাগত পদস্থ ব্যক্তি। তাই তাঁহার বাঙ্গালী পরিবারের সঙ্গে খুব বেশী মিশিবারই সুবিধা হয় নাই। এজন্য সরলার ছেলেবেলায় তাঁহার হাব-ভাব রকম-সকম দেখিয়া তাঁহাকে বাঙ্গালীর মেয়ে বলিয়া বুঝাই মুস্কিল হইত। সরলার মাথার সাম্‌নের দিকে ছোট ছোট কোঁকড়ান কোঁকড়ান চুল; মুখে পরিষ্কার ইংরাজি কথা; তাঁহার চলন-ফেরন ধরণ-ধারণ সকলই প্রায় ইংরাজের মেয়েদের মত। সরলা পাঁচ বৎসর বয়স হইতেই ইংরাজি ভাষায় কথা বলিতেন; তাই কলিকাতায় আসিয়া বাংলা ভাষায় ভাল করিয়া কথা বলিতে পারিতেন না। দার্জ্জিলিঙ্গে বাংলা ভাষা শিখিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ দেখা যাইত। আমার বেশ মনে পড়ে, তিনি "ভারতী"র হেঁয়ালী-নাট্য বাহির করিয়া মনোযোগের সহিত পড়িতেন। উহা পড়ায় তাঁহার কলিকাতা অঞ্চলের চল্‌তি কথা শিখিবার সুবিধা হইত।

সরলার খুব অল্প বয়সে শুধু যে তাঁহার সরলতাই লক্ষ্য করা যাইত, তাহা নহে; তিনি আমাদের সমাজের অনেক রীতিনীতিই শিখিতে পারেন নাই। আমাদের সমাজ বলিয়া কেন, একটি তের বৎসরের বালিকার সংসার ও সমাজ সম্বন্ধে যতটুকু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, সেরূপ জ্ঞানও তাঁহার কোন সমাজ সম্বন্ধেই ছিল বলিয়া মনে হয় না। হয় ত তাহাতে তাঁহার অপকার না হইয়া উপকারই হইয়াছিল। পৃথিবীর কোন মলিন চিত্র তাঁহার চোখে পড়িত না; সংসারের কোন দাগও তাঁহার চিত্তে অঙ্কিত হইত না; শিশুর মনের মত এই বালিকার

হৃদয় এমন স্বচ্ছ ও সরল ছিল যে, তাঁহার সঙ্গে মিশিলেই তাঁহার প্রতি কেমন একটি আকর্ষণ জন্মিত। এই জন্য সরলার স্বধর্ম্মাবলম্বী দার্জ্জিলিং-প্রবাসীদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহার প্রতি একটি অকৃত্রিম স্নেহ প্রকাশ করিতেন। সরলা যে বেথুন বোর্ডিংয়ে বাস করিতেন, সেখানেও আমাদের পরম শ্রদ্ধার পাত্রী কবি কামিনী রায় এবং পরলোকবাসিনী শ্রদ্ধেয়া কুমুদিনী দাস সরলাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাঁহার মধুর প্রকৃতির জন্য শৈশবসুলভ দোষত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া অনেক শিক্ষয়িত্রীই তাঁহাদের এই ছাত্রীর সদ্‌গুণগুলি লক্ষ্য করিতেন।

সরলা স্কুলের পড়াশুনায় খুব ভাল মেয়েই ছিলেন বটে; কিন্তু রেঙ্গুণে মেমদের স্কুলে পড়িবার জন্য তাঁহার সংস্কৃত শিখিবার সুবিধা হয় নাই। সেখানে বোধ হয়, তাঁহাকে সংস্কৃত ও বাংলার পরিবর্ত্তে ফরাসী ভাষাই শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। বেথুন স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া তিনি উহাকেই "দ্বিতীয় ভাষা" (Second Language)রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পরে জানিতে পারিব, সরলার ফরাসী ভাষায় বিলক্ষণ অধিকার ছিল; তিনি এই উৎকৃষ্ট ভাষার অনেক ভাল ভাল গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু বেথুন স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়া তাঁহার এই বিদেশী ভাষায় পরীক্ষা দিতে আর ইচ্ছা হইল না; তিনি উহা ত্যাগ করিয়া মাতৃভাষা বাংলাতেই পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এজন্য স্বতন্ত্র শিক্ষক নিযুক্ত হইল; এবং শ্রদ্ধেয়া কামিনী রায় স্বয়ং তাঁহার এই প্রিয় ছাত্রীকে বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য বিশেষ সাহায্য করিতে লাগিলেন। তাই দুই বৎসরের মধ্যেই সরলা চমৎকার বাংলা শিখিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিলেন। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল, সরলা প্রথম বিভাগে পাশ হইয়া মেয়েদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে; তিনি বাংলা ভাষাতেও সকলের

উপরের স্থানটি দখল করিয়া "কেশবচন্দ্র প্রাইজ্" লাভ করিয়াছেন। তাহার দুই বৎসর পরেই সরলা এফ, এ পরীক্ষা দিলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স ষোল বৎসর মাত্র; অথচ, তিনি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণা হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবম স্থান অধিকার করিলেন।

ইহার দুই বৎসর পরে বি, এ পরীক্ষা দিয়া, সরলা ইংরাজিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর "অনার" পাশ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দশম স্থান অধিকার করেন। তাহার পরে তিনি আর এম্, এ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হন নাই। তিনি একদিন কোন বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, "ডাক্তার পি, কে, রায় আমাকে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইয়া এম্, এ পড়িবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন; কিন্তু আমার ছেলেদের সঙ্গে বসিয়া পড়িতে বড় লজ্জা বোধ হয়। তাহা ছাড়া, আমার ভাই সুরেন যে বিরোধী। সুরেন বলে, "দিদি, তুমি যদি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হও, তবে আমি সে কলেজ ত্যাগ করিব।"

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্রদ্ধেয়া কবি কামিনী রায় সরলাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি স্বয়ং আমাকে বলিয়াছেন, এই পরম স্নেহের পাত্রী তাঁহার হৃদয়ের অনেকখানি অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি স্বরচিত "অম্বা" নাট্যকাব্যখানি আপনার দুই ভগিনী ও সরলাকে উৎসর্গ করিয়াছেন। উৎসর্গ-পত্রে লিখিয়াছেন, "সোদরাদ্বয় এবং প্রিয় ছাত্রী স্বর্গীয়া সরলা দেবী, এই তিনজনের সহিত অম্বা রচনার স্মৃতি বিশেষ ভাবে জড়িত, সেই জন্য ইহাদের নামে এই গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হইল।"

মিসেস্ রায় তাঁহার বুদ্ধিমতী ছাত্রীর নানা বিষয়ে স্বাভাবিক শক্তি, উচ্চ শিক্ষার প্রতি অনুরাগ, ভাল হইবার ও ভাল কাজ করিবার আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করিয়া, তাঁহাকে কয়েকখানি অতি উৎকৃষ্ট ইংরাজি

গ্রন্থ পড়িতে দিয়াছিলেন। সরলার ইংরাজি ভাষার উপরে অত্যন্ত দখল থাকায়, ঐ বইগুলি পড়িয়া, উহার মনোমুগ্ধকারী সৌন্দর্য্য ও সুমহৎ ভাব সহজেই আয়ত্ত করিতে পারিতেন; তাহা ছাড়া মিসেস্ রায় স্বয়ং ঐ সকল মূল্যবান গ্রন্থের চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়মন উন্নতকারী গভীর ভাবাত্মক বর্ণনাগুলি সরলাকে এমন ভাবে বুঝাইয়া দিতেন যে, উহা তাহার সুকুমার ও সুপবিত্র হৃদয়ের উপরে যেন মায়াকুহক বিস্তার করিত। কতকটা এই তরুণ বয়সের সুশিক্ষা এবং হয়ত বা কতকটা রেঙ্গুণের কন্‌ভেণ্টের সেবাব্রতধারিণী ও ধর্ম্মার্থে জীবন উৎসর্গকারিণী ইংরাজ মহিলাদিগের সুদৃষ্টান্তের জন্য, ভোগবিলাসের মধ্যে প্রতিপালিতা এই ধনীর কন্যার পাঠ্যাবস্থাতেই একটা কোন ভাল কাজে কিছু সময় দিবার জন্য অন্তরে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছিল।

সরলা অধ্যয়নের সময়েই বেথুন বোর্ডিং হইতে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনা ও উৎসবাদিতে গমন করিতেন। আচার্য্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের হৃদয়োন্মাদকারিণী বক্তৃতা ও প্রাণস্পর্শী উপদেশ তাঁহার বড়ই ভাল লাগিত। তিনি যে উহার সকল কথাই উত্তমরূপে বুঝিতে পারিতেন, তাহা নহে; তবুও তিনি ঐ সকল মনোযোগের সহিত শুনিতেন। উহাতে তাঁহার যথেষ্ট উপকার হইত। এজন্য সরলা শাস্ত্রী মহাশয়কে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। তাঁহার উপরে এমনই একটা মনের টান ছিল যে, সরলার বি, এ পরীক্ষায় পাশ হইবার পরে, যেদিন শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাদের বাড়ীতে যাইতেন, সেদিন সরলার মনে আর আনন্দ ধরিত না। সরলার বিবাহের সময়ে প্রচারকার্য্যে শাস্ত্রী মহাশয় বেলুচিস্থান যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন; কিন্তু সরলা তাঁহার পিতাকে বলিলেন, "বাবা, শাস্ত্রী মহাশয় আমার বিবাহের উপাসনা না করিলে, কিছুতেই আমার মন উঠিবে না।" তখন তাঁহার পিতার একান্ত অনুরোধে

শাস্ত্রী মহাশয় বেলুচিস্থান যাইবার দিন পরিবর্ত্তন করিয়া, সরলার বিবাহের অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করিলেন। এই সকল তুচ্ছ কথা লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, সরলার ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকদিগের প্রতি অন্তরের একটি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ছিল। কতকটা এই শ্রদ্ধার জন্যই, সরলা ধর্ম্মের একটা প্রবল হাওয়ার মধ্যে বাস করিতে না পারিলেও তৎপ্রতি মনের ভক্তি রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বপ্রকার মহৎ বিষয়ের প্রতি প্রাণের গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি যখন কিছুদিন দার্জ্জিলিং ছিলেন, তখন ত বয়স কতই অল্প; কিন্তু দেখিতাম, তিনি উপাসনার সকল কথা বুঝিতে পারুন আর না পারুন, বেশ শ্রদ্ধার সহিত উপাসনার পবিত্র স্থানটিতে গিয়া বসিতেন, নম্রভাবে আচার্য্যের কথাগুলি শ্রবণ করিতেন।

দার্জ্জিলিঙ্গে প্রায়ই সরলা এবং বাড়ীর অন্য ছেলেমেয়েরা গল্প বলার জন্য আমাকে ধরিয়া বসিতেন। গল্প বলা কাজটা যে আমার পক্ষে বিশেষ অপ্রীতিকর ছিল, তাহাও নহে। তবে দশ পনর দিন পরেই আমার পুঁজি ফুরাইয়া আসিল; অথচ বাড়ীর মেয়েরাও আমাকে ছাড়ে না। আমি তখন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি ধার্ম্মিক লোকদিগের জীবনের কথা গল্পের মতন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলাম। সরলা উহা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শুনিতেন, এবং শুনিতে শুনিতে কেমন একটি সুন্দর ভাবে তাঁহার নয়ন উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। তখন মহাত্মা কেশবচন্দ্রের প্রতি তাঁহার অতিশয় ভক্তি দেখিতে পাইতাম। তিনি বলিতেন "আমার বাবা কেশবচন্দ্রের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন।"

সরলা কেশবচন্দ্রের বিষয়ে তেমন কিছুই জানিতেন না। অথচ তাঁহার বাবা যে কেশবচন্দ্রকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন, এই জন্যই তাঁহারও কেশবচন্দ্রের উপরে ভক্তি ছিল। এই কথায় আমরা সরলার

পিতৃভক্তিরও পরিচয় প্রাপ্ত হইতেছি। যথার্থই সরলা তাঁহার পিতাকে বড়ই ভালবাসিতেন। পিতার কথা বলিতে বলিতে সেই দূর বিদেশে, তাঁহার করুণ নেত্রদ্বয়ে কেমন এক আনন্দের জ্যোতি বিকশিত হইয়া উঠিত। আর সরলার পিতা এই স্নেহের কন্যাকে কতই ভালবাসিতেন, কত অর্থব্যয় ও কত যত্ন করিয়া কন্যাকে সুশিক্ষিতা এবং সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা করিতে প্রয়াসী ছিলেন; কন্যার সম্বন্ধে তাঁহার মনে হয় ত কতই উচ্চ আশা ছিল। কিন্তু কালের কঠোর আঘাতে সেই আশা ভরসা সকলই নির্ম্মূল হইয়া গেল।

সরলা বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরে, কোন একটা ভাল কাজে কিছু সময় দিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। মনে তাঁহার এই ভাবেরই উদয় হইয়াছিল যে, একদিকে তাঁহার যথেষ্ট সময়, অন্যদিকে তেমনি দেশের অভাবও বিস্তর, রমণীদিগের সম্মুখে করিবার কাজও অসংখ্য; তাঁহার সে সকল করিতেও ইচ্ছা হয়। কিন্তু কিরূপে তাহা করিবেন? করিবার মত তাঁহার কি শক্তি আছে? শক্তি থাকিলেই বা সুবিধা কোথায়?

তিনি এই চিন্তায় বড়ই বিমর্ষ হইয়া তাঁহার কোনও শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, "আমি জীবনের কথা ভাবিতে ভাবিতে নিরাশ হইয়া পড়ি। আমি যে কি করিব, কিছুই ভাবিয়া পাই না। আপনি বলুন, আমি কি করিতে পারি?"

বন্ধু। তোমার বুদ্ধি আছে, প্রতিভা আছে, অন্তরে মহৎ আকাঙ্ক্ষা আছে; তুমি চেষ্টা করিলেই অনেক ভাল কাজ করিতে পার।

সরলা। আপনি আর পণ্ডিত মহাশয় শুধু আমার প্রশংসাই করেন। আপনারা ত আমার কথা কিছুই জানেন না।

বন্ধু। আর কিছু না হয়, তুমি সাহিত্যের অনুশীলন কর। কাগজে পত্রে লিখিতে চেষ্টা কর। সে ত একটা খুব বড় কাজ। তাহাতে

দেশেরও উপকার হইবে, তোমার মানসিক শক্তিও বিকশিত হইয়া উঠিবে।

সরলা। ঠিক্ বলিয়াছেন। সাহিত্যের সেবা খুব ভাল কাজ। কিন্তু বাংলা ভাষায় যে আমার বিদ্যা! আমি চেষ্টা করিলে ইংরাজীতে কিছু লিখিতে পারি, সেরূপ লেখায় লাভ কি?

সরলা একটু নীরব থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—"হাঁ, তবে একটা কাজে মনোনিবেশ করিতে পারি। এতদিন বোর্ডিংয়ে ছিলাম, এখন মায়ের কাছে আসিয়াছি। আমার অনেক ভাই বোন। আমি যদি ভাইবোনদের দেখি, তাহাদের পড়াশুনার উপর চোখ রাখি, তাহা হইলে মায়ের কাজের অনেক সাহায্য হয়।"

এই বিষয়ে সরলা তাঁহার ১৮৯৮ সালের ১লা বৈশাখের দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়াছেন, "পৃথিবীর কিছু কাজ করিতে এবং ভাই ভগিনী-দিগের প্রতি যে কর্ত্তব্য, তাহা সম্পন্ন করিতে ও পিতামাতার কার্য্যের সাহায্য করিতে চেষ্টা করিব—এইরূপ ভাবিতেছিলাম। এমন সময়ে—"

এখানে বলা প্রয়োজন, সরলার মাতা সন্তানদিগের সুশিক্ষার জন্য, এই সময়ে কলিকাতায় বাস করিতেন। তাঁহার সন্তানদিগের মধ্যে সরলাই সকলের বড় ছিলেন। সরলা ভাই ভগিনীদিগের শিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। ভাই বোনদের উপরে তাঁহার ভালবাসাও ছিল এবং শাসন করিবার ক্ষমতাও ছিল। ভাই বোনেরা সকলেই তাঁহাকে মান্য করিত। আমরা জানি, সরলা বিবাহের পরেও তাঁহার ভাই বোনদের অভিভাবকের মতন ছিলেন। একটা কিছু হইলেই সরলার মাতা কন্যার কাছে খবর পাঠাইতেন; কন্যার পরামর্শ লইয়াই তিনি কার্য্য করিতেন। সরলা প্রতি রবিবারই স্বামীর সঙ্গে মাতার বাসায় যাইতেন এবং সমস্ত দিন ভাই বোনদের সঙ্গে নানা কথায় ও আমোদে আহ্লাদে কাটাইতেন।

সরলার বি, এ পরীক্ষায় পাশ হইবার অগ্রেই ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাস মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছিল। সরলার পিতাই কন্যাকে এই বিবাহের জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু সরলা তখন তাঁহার পিতাকে বলেন, "আমি বি, এ পাশ না করিয়া কখনই বিবাহ করিব না।" তাহার পরে সতীশরঞ্জনের সঙ্গে সরলার বেশ আলাপ-পরিচয় হইল; তখন দুজনেই দুজনের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। তাঁহাদের অভিভাবকেরা চেষ্টা করিয়া যাহা পারেন নাই, পরস্পরের প্রীতির আকর্ষণে তাহা সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবেই সঙ্ঘটিত হইল। ইঁহারা দুজনেই সুপাত্র এবং সুপাত্রী। সতীশরঞ্জন দাস মহাশয় কলিকাতা হাইকোর্টের একজন বড় ব্যারিষ্টার, এখন তিনি এডভোকেট জেনেরল; আর তিনি সচ্চরিত্র, স্বদেশহিতৈষী এবং দয়াবান। তাঁহার সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধে সরলা স্বয়ং আপনার দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়াছেন—

"সংসারের কিছু কাজ করিতে, ভাই ভগিনীদের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে ও পিতামাতার কার্য্যের সাহায্য করিতে চেষ্টা করিব ভাবিয়াছিলাম। এমন সময়ে সতীশ আমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী হইলেন। তিনি বলিলেন, আমরা দুজনে জগতের কিছু ভাল কাজ করিব; এবং সেই কাজে সতীশরঞ্জন আমাকে যন্ত্রস্বরূপ করিবেন।"

এই বিবাহের পরে সরলা আপনাকে বড়ই সুখী মনে করিয়াছিলেন। তিনি একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, "এক সময়ে আমি ভাবিতাম, বিবাহ করিব না; কুমারী থাকিয়া কোনও ভাল কাজ করিব। কিন্তু এখন বুঝিতেছি, বিবাহে কত সুখ!"

সরলার এই বিবাহে ত সুখী হইবারই কথা। নির্ঝরিণী যেমন নদীর সঙ্গে আপনাকে মিশাইয়া দেয়, তেমনি এই সরল-হৃদয়া তরুণী আপনার প্রেমপূর্ণ হৃদয়খানি স্বামীর হৃদয়ের সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার স্বামীও এই সুশিক্ষিতা সুকুমারী পত্নীকে অন্তরের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও সুনির্ম্মল প্রীতি অর্পণ করিয়া জীবনসঙ্গিনীরূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্য এই উচ্চশিক্ষিত যুবক ও উন্নতহৃদয়া তরুণীর মিলনে, দুজনের জীবন প্রেমে ও পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। আমি আমার কোন শ্রদ্ধেয়া মহিলার কাছে শুনিয়াছি, সরলার জীবনের সৌন্দর্য্যে ও হৃদয়মাধুর্য্যে সতীশরঞ্জন এরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং সতীশরঞ্জনের মধুর ব্যবহারে ও গভীর ভালবাসায় সরলা এরূপ মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কেহ কাহাকেও না দেখিয়া অধিক সময় থাকিতে পারিতেন না; কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া অধিক দূরে যাইতে চাহিতেন না। আত্মীয় স্বজনেরা এই দুইটি তরুণ হৃদয়ের অপূর্ব্ব মিলন ও সেই মিলনের অনুপম আনন্দ নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় কৌতুক এবং সুখ অনুভব করিতেন।

বলিতে কি, এই পরিবারের পুরুষদিগের বিলক্ষণ স্ত্রী-সৌভাগ্য আছে। সতীশরঞ্জনের যিনি পিতা, সেই মহৎহৃদয়, পরদুঃখকাতর, নারীজাতির পরমহিতৈষী স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস মহাশয় প্রথম জীবনে যাঁহাকে পত্নীরূপে লাভ করিয়াছিলেন, এই ক্ষুদ্র জীবনচরিতটি রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, সেই ধর্ম্মশীলা ও দয়াবতী নারীর কথা কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না। তিনি হৃদয়ের মহত্ত্বে ও নিঃস্বার্থপরসেবায় যথার্থই দেবী ছিলেন। শুধু তাহাই নহে; সেই সাধ্বী নারী ব্রহ্মময়ী স্বামীর ধর্ম্মসংস্কার, সমাজসংস্কার এবং সমস্ত পরীক্ষা ও নির্য্যাতনের মধ্যে, তাঁহার জীবনসঙ্গিনী হইয়া প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর কার্য্য করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন, বিস্তর দুঃখী, অসহায় পুরুষ ও

নারীকে স্বীয় গৃহে স্থান দান করিয়া, নিজেরই পুত্রকন্যার ন্যায় তাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছেন। স্ত্রীলোকেরা যাহাতে উচ্চশিক্ষা ও স্বাধীনতা লাভ করিতে পারেন, সেজন্যও তিনি অনেক চেষ্টা ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। এই পরম স্নেহময়ী নারীর বিষয়ে আচার্য্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আপনার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন;—

"তাঁহার সেই সরল পবিত্রতা মাখা মুখখানি যেন আমার স্মৃতিতে জাগিতেছে। প্রসন্নময়ীর ন্যায় তাঁহার সন্তানের ক্ষুধা যেন নিজ সন্তান দিয়া মিটিত না। তিনিও কতকগুলি নিরাশ্রয় বালিকাকে নিজ ভবনে আশ্রয় দিয়া পালন করিতেছিলেন। ব্রহ্মময়ী আমার সর্ব্ববিধ সদনুষ্ঠানের উৎসাহদায়িনী ছিলেন। * * তাঁহার মৃত্যুতে আমরা, বিশেষতঃ আমি, মর্ম্মাহত হইলাম। ব্রহ্মময়ীর জন্য, দুর্গামোহন বাবুর বাড়ী আমার জুড়াইবার স্থান ছিল।"

ব্রহ্মময়ীর জীবনচরিত-রচয়িতা তাঁহার গ্রন্থের একটি স্থানে এই সাধ্বী নারীর বিষয়ে লিখিয়াছেন,—"ব্রহ্মময়ী ধর্ম্মনিষ্ঠ ও সদাচারিণী ছিলেন; তিনি পরোপকারিণী হইয়াও নিজ পরিবারের শুভাশুভ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। তিনি অতিশয় পতিপরায়ণা ও সন্তান-বৎসলা ছিলেন। পতির সাধুতা ও সদাচরণের প্রতি তাঁহার দৃঢ়তর আস্থা ছিল। * * যখন তাঁহার স্বামী ও তাঁহার অন্যতর বন্ধু শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসুর যত্নে গত আষাঢ় মাসে "বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়" সংস্থাপিত হয়, তখন তাঁহার আনন্দের সীমা ছিল না। তিনি কাল-বিলম্বের আশঙ্কা করিয়া স্বামী ও অপর উদ্যোগকারীর কলিকাতায় অনুপস্থিতি কালে নিজ তহবিল হইতে টাকা দিয়া বিদ্যালয়ের আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।"*

* "জীবনালেখ্য" দেখুন।

এই পুণ্যবতী ও পতিব্রতা নারীর পবিত্র স্মৃতি যে গৃহে বিরাজ করিতেছিল, সেই গৃহের উচ্চশিক্ষিতা ও আদরিণী বধূ হৃদয়ের অপূর্ব্ব মাধুরীতে স্বামীকে সুখী, প্রিয়জনকে সন্তুষ্ট, বন্ধুদিগকে খুসী করিতে না পারিলেই অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হইত।

আমরা ইতিপূর্ব্বে, সরলার স্বামীর প্রতি যে গভীর ভালবাসা, সেই কথারই উল্লেখ করিতেছিলাম। বলিতে কি, সরলার সুকুমার হৃদয় সুমিষ্ট ভালবাসায় পরিপূর্ণ ছিল। তিনি যে সেই ভালবাসায় শুধু তাঁহার স্বামীকেই মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা নহে; সরলার পরিচিত প্রিয়জনেরাও তাঁহার সুনির্ম্মল স্নেহ প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে বড়ই সুখী মনে করিতেন। সরলা নিজেও আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ ও ভালবাসা পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন, এবং তাহা অতি সহজেই লাভ করিতে পারিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার স্বামী লিখিয়াছেন,—

"অপরের ভালবাসা ও সদ্ভাব লাভ করিবার জন্য তাঁহার কি ব্যাকুলতাই ছিল! তাঁহার পক্ষে ইহা বড় সৌভাগ্যের বিষয়ই ছিল যে, যাঁহারা তাঁহাকে ভাল করিয়া জানিতেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই সরলাকে ভালবাসিতেন এবং তাঁহার প্রশংসা করিতেন। সরলার ভিতর এমন এক আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, পৃথিবীর দুই কেন্দ্রের ন্যায় বিভিন্ন প্রকৃতি-বিশিষ্ট লোকেরাও তাঁহার বন্ধু ছিলেন। ধার্ম্মিক এবং নাস্তিক, তরুণ-বয়স্ক এবং পূর্ণবয়স্ক, যাঁহারাই তাঁহার সংসর্গে আসিতেন, তাঁহারাই তাঁহাকে ভালবাসিতেন।"

আমরা অনেক জায়গায়ই দেখিয়াছি, যে সকল তরুণী নারীর বয়স অতি অল্প, অন্তর অত্যন্ত কোমল, হৃদয় একেবারে ভালবাসায় ভরা, তাহাদের মধ্যে কাহারো কাহারো স্বামীর ভালবাসা বিষয়ে সংযম, সহিষ্ণুতা ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের কিছু অভাব থাকে। কিন্তু সরলা অত্যহারা

হইয়া স্বামীকে ভালবাসিতেন, অথচ স্বামীর কাজের সময়ে, তাঁহার আত্মসংযম ও কর্ত্তব্যজ্ঞান যথেষ্টই লক্ষ্য করা যাইত। এ বিষয়ে আমরা দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। সরলার বিবাহের দু মাস অতীত হওয়ার পরেই, একটা খুব দরকারি কাজের জন্য সতীশরঞ্জনকে বোম্বাই যাইতে হইয়াছিল। উহার অনেকদিন পূর্ব্ব হইতেই উক্ত সহরে প্লেগ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। ঐ সময়ে কলিকাতার লোকের ঐ ভীষণ রোগটার নামেই প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হইত। সুতরাং প্লেগের নামে সরলার অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হওয়াই স্বাভাবিক। ভয় হইয়াছিল বলিয়াই সরলা প্রথমে স্বামীকে বলিয়াছিলেন, "আমি তোমাকে কিছুতেই বোম্বাই যাইতে দিব না।" তৎপরে তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার স্বামীর বোম্বাই যাওয়া একান্তই প্রয়োজন, তখন তিনি কঠোর কর্ত্তব্যজ্ঞানের দ্বারা আপনার ইচ্ছাকে সংযত ও মনকে বশীভূত করিলেন। এই ঘটনা সম্বন্ধে সরলা তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে যেটুকু লিখিয়াছেন, তাহার দু একটি লাইন বড়ই মিষ্ট; আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি —

"S (সতীশরঞ্জন) বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন। অত্যন্ত খারাপ লাগিতেছে। আমি কাঁদি নাই। কারণ, তিনি যাইবার পূর্ব্বে আমার মুখে হাসি দেখিতে চাহিয়াছিলেন।"

সতীশরঞ্জন যখন বোম্বাই সহরে যাত্রা করেন, তখন বলিয়াছিলেন, তিনি সাত দিনের মধ্যেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবেন। কিন্তু কাজের ঝঞ্ঝাটে তাঁহার ঐ সময়ের মধ্যে ফিরিয়া আসা ত দূরের কথা; তিনি বাড়ীতে তাঁহার বড় ভাইয়ের নিকট চিঠি লিখিলেন, "আমার আরো কিছুদিন বোম্বাই সহরে থাকা প্রয়োজন; এ বিষয়ে আপনাদের মত কি, লিখিয়া জানাইবেন।" বড় ভাই সরলাকে বলিলেন, "তুমি কি বলিতে চাও বল দেখি? সতীশরঞ্জনকে সত্বরই কলিকাতায়

আসিতে লিখিব, না তিনি আরো দিন কয়েক বোম্বাই থাকিয়া কাজটা শেষ করিয়া আসিবেন?" সরলার ত ইচ্ছা, সতীশরঞ্জন আর একটি ঘণ্টাও বোম্বাই সহরে বিলম্ব না করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। কিন্তু কঠোর কর্ত্তব্যজ্ঞানের দ্বারা সে ইচ্ছাকে সংযত করিলেন। ভাসুরকে বলিলেন, "আপনি যাহা ভাল বিবেচনা করেন, তাহাই করুন।"

কিন্তু সতীশরঞ্জনের বোম্বাই সহরে আরো পনের দিন বিলম্ব হইবে শুনিয়া, সরলা আর তাঁহাকে আপনার মনের কথা না লিখিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি লিখিলেন—"আমি কাল সন্ধ্যার সময়ে শুনিলাম, বোম্বাই সহরে তোমার আরো পনের দিন বিলম্ব হইবে। শুনিয়া আমার অত্যন্ত খারাপ লাগিতেছে। আমি ত বাড়ীর সকল লোকের সম্মুখেই প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলাম। * * তুমি রবিবার কলিকাতায় আসিবে ভাবিয়া আমার মনে কতই আনন্দ হইয়াছিল। তা যা'ক, এখন আর সে কথা ভাবিয়া কি হইবে? তুমি যে তোমার কর্ত্তব্য পালন করিতেছ, তাহার সুফল ঈশ্বর তোমাকে প্রদান করিবেন; এবং আমার প্রতি ঈশ্বরের যে অশেষ করুণা, সেই করুণায় নিশ্চয়ই তোমাকে সুস্থ শরীরে ফিরাইয়া আনিবেন।"

সরলার এইরূপ কর্ত্তব্যজ্ঞানের ও আত্মসংযমের আরো অনেক দৃষ্টান্ত আছে। সরলার মৃত্যুর একমাস পূর্ব্বে, তাঁহার অল্প অল্প জ্বর হইতেছিল। ডাক্তার তাঁহাকে বাহিরে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার স্বামী কাছারি হইতে ফিরিয়া আসিয়া আর বেড়াইতে যাইতে চাহিতেন না। তিনি জানিতেন, সেই স্নিগ্ধ অপরাহ্লে সরলার কাছে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিলে, তাঁহার মনটা ভাল থাকিবে, তিনি বড়ই খুসী হইবেন। কিন্তু সরলা আপনার সুখ ও সন্তোষের চেয়ে স্বামীর স্বাস্থ্যের প্রতিই অধিক দৃষ্টি রাখিতেন। তাই তিনি সেই সময়ে স্বামীকে মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ, অথবা একটু টেনিস খেলিবার জন্য

পীড়াপীড়ি করিতেন। এমন কি, মৃত্যুর দিন সরলা যখন বেদনায় অত্যন্ত কাতর, তখনও তাঁহার স্বামীকে কাছারি যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিলেন।

আমাদের দেশের বিস্তর লোকের মনে এই রকম একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, মেয়েরা লেখাপড়া শিখিলেই অনেক সময় নিজের পড়া, নিজের সুখও সুবিধা এবং নিজের খুঁটিনাটি কাজ লইয়াই ব্যস্ত থাকিবে; গৃহকার্য্য, সন্তানপালন, পতিসেবা—এই সকল অত্যাবশ্যক বিষয়ের প্রতি আর মনোযোগ দিবারই অবসর হইবে না। আমরা সরলার জীবনের ঘটনার দ্বারা এই অন্যায় উক্তির প্রতিবাদ করিতে পারি। দুঃখের বিষয়, সরলার সন্তানাদি জন্মগ্রহণ করে নাই, কিন্তু সরলা ধনসম্পদের মধ্যে পালিতা এবং সংসারের নানা বিষয়ে অনভিজ্ঞা হইয়াও, তাঁহার স্বামীকে গৃহের সমস্ত চিন্তা হইতে দূরে রাখিয়াছিলেন; এবং নিজের সুশিক্ষা ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের জন্যই ঘরকন্নার কার্য্যে মনোযোগ দিতে এবং গৃহের সৌন্দর্য্য ও শৃঙ্খলা উত্তমরূপে রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। আমাদের কাছে সরলা নিজেই বলিয়াছেন, সময় সময় প্রয়োজন হইলেই তিনি স্বহস্তে রান্না করিতেন। তাঁহার স্বামী যে কয়েকটি তরকারি খাইতে খুব ভালবাসিতেন, অনেক সময় নিজেই তাহা তিনি রান্না করিতেন। এ বিষয়ে একদিন সরলার সঙ্গে আমার যে কথা হইয়াছিল, এ স্থানে তাহারই উল্লেখ করিব। আমি নিরামিষ খাই, মাছ, মাংস কি ডিম কিছুই খাই না। সরলা একদিন আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইবার জন্য বলিতেছিলেন—"আপনাকে মাছ খাইতেই হইবে। আমরা প্রতিদিন যাহা খাইতে পারি, আপনি কি আমার অনুরোধে একটি দিনও তাহা খাইতে পারিবেন না?"

আমি। "কেন? তোমার রান্না করিবার লোকটি বুঝি নিরামিষ তরকারি রাঁধিতে পারে না?"

সরলা। লোকটি না পারিলেও আমি ত পারি।

আমি। তুমি কি রান্না করিতে পার?

সরলা। বটে! আপনি বুঝি মনে করেন, আমি রান্না করিতে জানি না। এই ত সাতদিন আমি নিজের হাতেই রান্না করিয়াছি।

আমি। কেন?

সরলা। রান্না করিবার লোকটির শরীর বড় খারাপ। প্রায়ই জ্বর হয়। বেচারা গরীব, ছাড়াইয়াও দিতে পারি না। কাজেই আমার রান্না করিতে হয়।

আমি। কি রকম রান্না কর? খুব ভাল?

সরলা। ওঁর ত বেশ ভালই লাগে। আর আপনারও বোধ হয় ভাল লাগিবে। আপনি আমাকে ভালবাসেন কি না!

এইরূপ ঘরকন্না ও স্বামীর সমস্ত কর্ম্মে, সরলা কি রকম সাহায্য করিয়াছেন, এখন সেই বিষয়ে আমরা শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাস মহাশয়ের একটি লেখা হইতে অনেকগুলি কথা উদ্ধৃত করিব। সরলার মৃত্যুর পরে তিনি তাঁহার স্বর্গীয়া পত্নীর জীবনের অনেক চিত্তাকর্ষক ঘটনা ইংরাজীতে লিপিবদ্ধ করিয়া আমার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। আমি এই রচনার স্থানে স্থানে উহার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করিব। মিষ্টার দাস এক জায়গায় লিখিয়াছেন—

"সরলা তাঁহার স্বামীর জন্য যে কি করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করা নিতান্ত সহজ নহে। বিবাহের পরে তাঁহার স্বামীর যে কিছু উন্নতি হইয়াছে, বলিতে গেলে তাহা সম্পূর্ণরূপে সরলার চেষ্টায়ই হইয়াছে। সরলা তাঁহার স্বামীর ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্য্যেই সাহায্য করিতেন। যদিও সরলার সাংসারিক জ্ঞানের অত্যন্ত অভাব ছিল, তথাপি সরলার ভিতর এমন এক স্বাভাবিক কর্ত্তব্যজ্ঞান (Instinct) ছিল যে, তাঁহার কি করা উচিত, কি করা অন্যায়, তাহা সর্ব্বদাই বুঝিতে পারিতেন। তিনি

তাঁহার স্বামীকে কি গভীরভাবেই ভালবাসিতেন এবং স্বামীর ভালবাসা পাইবার জন্য তাঁহার কি ব্যাকুলতাই ছিল! তবুও স্বামীর যে কি কর্ত্তব্য তাহা তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইতেন না। ****" তিনি তাঁহার স্বামীর মঙ্গলের জন্য কিরূপ চিন্তা করিতেন, তাহা তাঁহার দৈনন্দিন লিপির নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ১৮৯৮ সালের ৬ই জুন সরলা লিখিয়াছেন—

"আমি চাই, আমার স্বামী যেন সর্ব্বতোভাবে বিবেকপরায়ণ হন। সর্ব্বপ্রকার মহৎভাবে তাঁহার অন্তর যেন উন্নত হইয়া উঠে। উহাতেই ত মানুষের প্রকৃত গৌরব। আমার স্বামীকে যখন বিবেকানুমোদিত, মহৎ ভাবপূর্ণ বাক্য উচ্চারণ করিতে শুনি, তখন আমিও অতিশয় গৌরব অনুভব করি। কর্ত্তব্য ঈশ্বরবাণীর কঠোর-প্রকৃতি-দুহিতা। (Duty is the stern daughter of the Voice of God) এই কর্ত্তব্যের আদেশ পালনের সুখই পৃথিবীতে প্রকৃত সুখ। কিন্তু এই আদেশ পালন করাই অত্যন্ত কঠিন। হায়! আমি যদি কর্ত্তব্যপরায়ণা হইতে পারিতাম! মহৎভাবেই যদি আমার অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিত! **** তাহা হইলে আমার স্বামীর অনেক সাহায্য করিতে পারিতাম। আমি যাহা ভাল মনে করি না, এমন কোন কার্য্য আমার স্বামীকে করিতে দেখিলে, অথবা সেইরকম কোন কথা বলিতে শুনিলে মনে বড়ই আঘাত পাই। কারণ, আমার স্বামী সমস্ত বিষয়েই আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আমি তাহাই বিশ্বাস করিতে চাই। যথার্থই তিনি আমার চেয়ে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। ****"

"সরলা তাঁহার স্বামীকে সকল কার্য্যে সাহায্য করিতে পারিবেন, এই আশায় তিনি আইন পড়িতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। লর্ড এল্‌ডন্ যখন John Scott নামে পরিচিত, যখন লর্ড উপাধি পাওয়া ত দূরের কথা, ব্যারিষ্টারি ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে

হইত; তখন তাঁহার পত্নী তাঁহার জন্য কি করিয়াছিলেন, একদিন সরলার স্বামী তাঁহাকে সেই কথা পড়িয়া শুনাইতেছিলেন। একটি স্থানে লেখা ছিল, লর্ড এল্‌ডন্ সংসারের কোন কাজে মনোনিবেশ করিলে পাছে বা তাঁহার ব্যারিষ্টারি ব্যবসায়ের উন্নতির কোনরূপ ব্যাঘাত হয়, সমগ্র শক্তি ব্যারিষ্টারি কার্য্যের উন্নতির জন্য নিয়োগ করিতে অসমর্থ হন, এইজন্য লেডী এল্‌ডন্ কখনো স্বামীকে সংসারের কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে দিতেন না। সরলা এই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই লেডী এল্‌ডনের মত পত্নী হইতে চেষ্টা করিবেন। সরলা এজন্য ঈশ্বরের চরণে ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করিতেন। সরলার দৈনন্দিন লিপির একটি স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি প্রার্থনা করিতেছেন,—

'হে ঈশ্বর, তুমি আমাকে এবং আমার স্বামীকে দয়া কর। আমরা যেন দুজনে দুজনকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে পারি। আমি আদর্শ পত্নী হইবার জন্য কতই ব্যাকুল! প্রভু, তুমি আমাকে সাহায্য কর, সাহায্য কর।'

"সরলার সঙ্গে যাঁহারা ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, ঈশ্বর সরলার এই সরল প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। সচরাচর গৃহের যে সকল কাজ পুরুষেরাই করিয়া থাকেন, সে সকল কাজও তিনি নিজেই করিতে চেষ্টা করিতেন। বলিতে গেলে তিনি তাঁহার স্বামীর সকল কার্য্যে মন্ত্রীস্বরূপ ছিলেন। স্বামী তাঁহার পরামর্শের বিপরীত যে দুই একটি কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহারও পরিণাম দেখিয়া তিনি পরিষ্কার বুঝিয়াছিলেন যে, সরলার পরামর্শ অনুসারেই চলা উচিত ছিল। ইহার পরে সরলার স্বামী কি সংসারিক, কি বৈষয়িক, কোন কাজেই তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করেন নাই।"

সরলার স্বামীর এই উৎকৃষ্ট বর্ণনাটি পাঠ করিতে করিতে চোখের

সাম্‌নে এমন একটি তরুণী নারীর মনোরম চিত্র উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, যে তাহার বর্ণে ও সৌন্দর্য্যে মন মুগ্ধ হইয়া যায়, এবং মনে হয় সরলা যথার্থই সরলচিত্ত, বুদ্ধিমতী, স্নেহশীলা ও কর্ত্তব্যপরায়ণা নারী ছিলেন।

সর্ব্বশেষে সতীশরঞ্জন লিখিয়াছেন, "সরলা কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংসারে আসিয়াছিলেন, আমি তাহার কিছুই জানি না। তবে সরলা যে তাঁহার চারিবর্ষব্যাপী বিবাহিত জীবনের দ্বারা, যাহা কিছু উৎকৃষ্ট, যাহা কিছু সৎ, তৎপ্রতি তাঁহার স্বামীকে আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছেন, উহাতেই তাঁহার মহত্ত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।"

আমরা জানি না, প্রকৃত সাধ্বী স্ত্রীর পক্ষে ইহার চেয়ে আর কি গৌরবের বিষয় হইতে পারে। যে স্ত্রীর মৃত্যুর পরে স্বামী শ্রদ্ধায় মন পূর্ণ করিয়া কৃতজ্ঞ অন্তরে তাঁহার মহদ্‌গুণ বর্ণনা করেন, যথার্থই সেই স্ত্রীর নারীজন্ম সার্থক। উচ্চ শিক্ষায় এবং নূতন আদর্শে মেয়েরা যদি চিন্তায় ও কর্ম্মে, জ্ঞানে ও ধর্ম্মে স্বামীর সঙ্গিনী হইয়া, স্বামীকে পূর্ণ করিয়া তোলেন, স্বামীর সঙ্গে এক প্রাণ হইয়া তাঁহার সকল কার্য্য সফল ও শ্রীসম্পন্ন করেন, তাহা হইলে নারীর উচ্চ শিক্ষা সার্থক। সেরূপ শিক্ষায় যদি কোন তরুণীর গৃহকার্য্যের অবসর একটু কমই থাকে, তাহা হইলেও আমরা বিশেষ ক্ষতি বোধ করিব না। কারণ, কঠোর জীবন সংগ্রামে কে সঙ্গিনী হইতে পারে? অসম্পূর্ণ জীবনকে কে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে? হৃদয়মাহাত্ম্যে কে পুরুষকে মহৎ করিয়া তুলিতে পারে? যে শিক্ষিতা নারী তাহা পারেন, তিনিই আমাদের প্রকৃত সম্মানের পাত্রী। আমরা নত মস্তকে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করি।

তর্কের খাতিরে যিনিই যাহা বলুন না কেন, পুরুষ ও নারীর শিক্ষার উন্নতির উপরেই সর্ব্বপ্রকার উন্নতি নির্ভর করে। ইহা সরলা বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি বিবাহের পরে, স্বামীর সমস্ত কার্য্যের সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও আপনার উন্নত শিক্ষা ও উচ্চতম মনোবৃত্তি সকলের বিকাশের কথা কখনই বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। এজন্য তিনি বিস্তর গ্রন্থ পড়িতেন এবং উহার ভাল ভাল কথাগুলি লইয়া চিন্তা করিতেন। সেই চিন্তাগুলি আবার আপনার দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়া রাখিতেন। আমরা তাঁহার ডায়েরির দুইটি জায়গা হইতে গুটিকয়েক কথা উদ্ধৃত করিতেছি।

সরলা ১৮৯৮ সালের ২১শে মার্চ্চ টমাস্ হার্ডি প্রণীত "Two in a Tower" নামক বই পড়িয়া লিখিতেছেন—"আমরা যাঁহাদিগকে ভালবাসি, তাঁহাদিগের উপকার করিবার জন্য সর্ব্বদাই কত ব্যস্ত হই, এ বিষয়ে আমরা কতই অধীরতা প্রকাশ করি। কত সময় আমাদের অহংভাব আমাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করে; তবুও মনে করি, আমরা প্রিয়জনের কল্যাণের জন্যই চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু এরূপ মনে করা কি ঠিক? আমরা যখন সম্পূর্ণরূপে আমাদের আমিত্বকে প্রিয়জনের অস্তিত্বের মধ্যে বিলীন করিতে পারি, প্রকৃতপক্ষে তখনই আমরা প্রিয়জনের মঙ্গলজনক কার্য্য করিতে সমর্থ হই।"

"২৪শে মার্চ্চ, ১৮৯৮। টেনিসনের জীবনচরিতের Mrs. Vynerএর লিখিত চিঠিখানি এবং তাহার নিম্নলিখিত উক্তিগুলি কি সুন্দর!—

'The only thing that makes life, when far away from home and friends, alone and in a wild country, beautiful and endurable is the strong and stern sense

of duty, the consciousness that where God has placed us is our lot to be, and that our most becoming posture is to accept our destiny with grateful humility.'

"এই সকল কথা অতি সত্য। কিন্তু এই রকম কঠোর কর্ত্তব্যজ্ঞান ঠিক রাখা কতই কঠিন! যদিও আমাদের সম্বন্ধে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা সহ্য করিয়া যাই এবং বলি যে, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। কিন্তু এই কথায় কি প্রকৃত কর্ত্তব্যপরায়ণ জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়, না ঈশ্বর আমাদের প্রতি যে বিধান করেন, সেই বিধানকে নত মস্তকে মানিয়া লওয়া হয়? এইরূপ নির্ভর কখনই ত প্রকৃত নির্ভর নহে। দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, আমাদের পক্ষে যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ঈশ্বর তাহা জানেন এবং তিনি আমাদের আত্মার পক্ষে যাহা কল্যাণজনক, তাহাই বিধান করিতেছেন। আমাদের সুখ দুঃখ উভয়ের জন্যই পূর্ণ অন্তরে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইতে হইবে। আমাদের এইরূপ অবস্থা হইলেই আমরা যে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিতেছি, এ কথা বলা সার্থক হইবে।"

সরলা শুধু যে ইংরেজি ভাষায় বিস্তর গ্রন্থ পাঠ করিয়া, সেই ভাষাই উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা নহে। আমরা ত বলিয়াছি, তিনি ফরাসী ভাষাও অতি উৎকৃষ্টরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। উক্ত ভাষার একখানি খুব ভাল বই তিনি ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া রাখিয়াছেন। বাংলা ভাষায় কিছু লিখিবার জন্য তাঁহার মনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও রচনা অতিশয় আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। আমার এখনো বেশ মনে পড়ে, আমি যখন তাঁহাদের বিডন ষ্ট্রীটের ছোট বাড়ীখানিতে এক একদিন তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইতাম, তখন রবীন্দ্রনাথের কাব্যসম্বন্ধে

আলোচনা আরম্ভ হইত। একদিন তিনি আমার একান্ত অনুরোধে "চিত্রা" কাব্যের শব্দের ঝঙ্কারে মনোমুগ্ধকারী এবং রসমাধুর্য্যে চিত্তহারী একটি কবিতা পাঠ করিয়া শুনাইতেছিলেন। তাঁহার সুমিষ্টস্বরে কবিতাটি যেন সুধাধারায় সিক্ত হইয়া উঠিতেছিল। সরলা আমাকে বলিতেন,"আমার মনে হয়, বর্ত্তমান সময়ে বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথই শ্রেষ্ঠ লেখক এবং শ্রেষ্ঠ কবি।"

রবীন্দ্রনাথের কোন সুন্দর রচনা প্রকাশিত হইলেই, সে বিষয়ে আমিও সরলাকে চিঠি লিখিতাম, তিনিও আমাকে পত্র লিখিয়া তাঁহার মনের আনন্দ প্রকাশ করিতেন। সরলার একখানি চিঠি আমার সম্মুখেই আছে। উহার এক জায়গায় তিনি লিখিয়াছেন, "প্রদীপ" পড়িয়াছি। রবি বাবুর কবিতাটি বড় ভাল লাগিয়াছে। "ভারতী"ও আসে। রবি বাবু প্রায় সমস্তই লিখিয়াছেন।**** Lectureটা অতি সুন্দর।"

সরলা "প্রদীপের" যে কবিতাটির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এই—

"বিশ্ব জগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আত্মপর!
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর!
কিসেরি বা সুখ, ক-দিনের প্রাণ?
ওই উঠিয়াছে সংগ্রাম গান,
অমর মরণ রক্ত চরণ
নাচিছে সগৌরবে;
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।"

সরলার বাংলা ভাষায় কিছু লিখিবার আগ্রহ দেখিয়া হয় ত কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি আগে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা কর, তাহার পরে বাংলা ভাষায় কিছু লিখিতে চেষ্টা করিও। সংস্কৃত না শিখিলে খুব ভাল বাংলা লিখিতে পারা যায় না।" সরলা রবীন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া, তাঁহাদের বাড়ীর পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব মহাশয়ের কাছে সংস্কৃত পড়িতেছিলেন। তিনি কয়েক মাসের মধ্যেই সংস্কৃত অনেকটা শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়, দুরন্ত মৃত্যু আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল; তাঁহার মনের সাধ মনেই রহিয়া গেল! আর সংস্কৃত শেখাও হইল না, বাংলা ভাষাতেও কিছু লিখিতে পারিলেন না। পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব মহাশয় তাঁহাকে অল্প দিন মাত্র পড়াইয়াই তাঁহার সরলতায় ও সদ্‌গুণে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বিদ্যার্ণব মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হইলেই তিনি সরলার কতই প্রশংসা করিতেন। সরলার একখানি জীবনচরিত রচনা করিবার জন্য, শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাস মহাশয় তাঁহার হস্তে উহার অনেক উপকরণও দিয়াছিলেন। আজ লিখি, কাল লিখি করিয়া আর তাঁহার লিখিবার সুবিধা হইল না।

সরলার চিত্রবিদ্যার প্রতি অন্তরের একান্ত অনুরাগ ছিল। তিনি তাঁহার স্বহস্তে অঙ্কিত একখানি ছবি আমাকে দেখাইয়াছিলেন। ছবিখানি বেশ সুন্দর।

সরলার জ্ঞানালোচনা ও সাহিত্যচর্চ্চার পরেই, তাঁহার মহৎ বিষয়ের প্রতি যে অন্তরের একান্ত অনুরাগ এবং কোনপ্রকার মহৎ কার্য্য করিবার জন্য যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা,—সেই কথাই মনে পড়ে। তাঁহাদের বাড়ীতে নানা শ্রেণীর লোক উপস্থিত হইতেন, নানাপ্রকার লোকের সঙ্গে মিশিয়া, তাঁহাদের অনেক কথায় তাঁহার যোগদান করিতে হইত। কিন্তু তিনি আমাকে বলিয়াছেন, মহৎ বিষয়ের আলোচনায় তাঁহার চিত্ত যেরূপ পুলকে পূর্ণ হয়, এমন আর কিছুতেই নহে। এজন্য

সরলার সঙ্গে দেখা করিতে গেলেই, আমার সঙ্গে তাঁহার অনেক উৎকৃষ্ট বিষয়ের আলোচনা হইত। আলোচনার পরে তিনি বলিতেন, "আপনার সঙ্গে যেদিন খুব ভাল ভাল বিষয়ে আলোচনা হয়, সেদিন আমার মন অনেক উঁচুতে উঠিয়া যায়।"

ব্রাহ্মসমাজের কোন স্থানে কোন মহৎ অনুষ্ঠান হইতেছে শুনিলে, তৎসঙ্গে যোগ রাখিতে তাঁহার একান্ত ইচ্ছা হইত। যে সকল যুবকেরা সমাজের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের চরণে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি সরলার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। সরলা তাঁহাদিগের সঙ্গে মিশিয়া ধর্ম্ম ও সমাজসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিতে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। সরলার বিবাহের কিছুদিন পূর্ব্বে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় যুবকদিগের জন্য একটি "মণ্ডে মিটিং" করিয়াছিলেন। সেখানে প্রতি সোমবার বিস্তর যুবক সম্মিলিত হইতেন। শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত সভায় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া যুবাপুরুষদিগের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা ও সৎপ্রসঙ্গ করিতেন এবং তাঁহাদিগকে সৎ কার্য্যে উৎসাহিত করিয়া তুলিতেন। সরলা এই সভাটির কথা শুনিতে পাইয়া আমাকে বলিয়াছিলেন—"আমার ঐ রকম সভার সঙ্গে যোগ রাখিতে বড়ই ইচ্ছা হয়।"

আমি। তা বেশ ত; তুমি প্রতি সোমবার সভাতে যাইবে। আমি শাস্ত্রী মহাশয়কে বলিব, তিনি তোমার বসিবার উত্তম বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।

সরলা। না না, সে হইবে না। সেখানে সকলেই পুরুষ, তাঁহাদের সাম্‌নে আমি একটি মাত্র মেয়ে গিয়া বসিব, আমার ভারি লজ্জা বোধ হইবে। শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হইলে আমি নিজেই তাঁহাকে বলিব, "আপনি যুবকদের জন্য মণ্ডে মিটিং করিয়াছেন, বড় মেয়েদের জন্য কি কিছুই করিবেন না?"

সরলা যথার্থই শাস্ত্রী মহাশয়কে এই কথা বলিয়াছিলেন। পরিণত বয়স্কা মেয়েদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য একটা কিছু করা যায় কি না, শাস্ত্রী মহাশয়ও তাহা ভাবিতেছিলেন। ইতিমধ্যে সরলার বিবাহ হইয়া গেল।

সরলা শুধু যে মহৎ বিষয়ে মৌখিক আলোচনা করিয়া মনের একটা কৌতূহল নিবৃত্ত করিতেন, তাহা নহে। কোন মহৎ কার্য্যের সঙ্গে যুক্ত হইয়া নারীজীবনকে গৌরবান্বিত করিবার জন্য, তাঁহার প্রাণ যে কি রকম ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার ডায়েরি পড়িলে সে কথা অতি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। আমরা এস্থানে তাঁহার দৈনন্দিন লিপি হইতে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"১লা বৈশাখ, ১৩ই এপ্রিল। জগতে চিরস্থায়ী কিছু করিয়া যাইতে হইবে। কিছু না করিয়া, আমার অস্তিত্বের কোন চিহ্ন না রাখিয়া, যেমন সংসারে আসিয়াছিলাম, তেমনি যেন চলিয়া না যাই।"

"১০ই আগষ্ট। শুধুই মনে হয়, শীঘ্রই আমার মৃত্যু হইবে। জানি না কেন এ ভাব আমার মনে আসে। আমি কাঁদিতেছি। হায়, আমি কাহারো জন্য কিছুই করিতে পারিতেছি না। এমন কি, সতীশের জন্যও না। প্রায়ই মনে করিতাম, আমি কিছু না কিছু করিতে পারিবই ; কিন্তু দেখিতেছি, আমার কোন শক্তি নাই। এত দুর্ব্বল, আমি কি করিব, বুঝিতে পারি না। আত্মজীবন লইয়াও সুখী নহি, জগতে কাহারো জন্য যে কিছু করিতেছি, তাহাও নহে। আমার জীবন নিতান্তই অসার।"

দেশের কোনও মহৎ কাজে আপনার কিছু সময় দিবার জন্য, সরলার মন ত এইরকম ব্যাকুল ; অথচ তিনি উচ্চশিক্ষিতা মহিলা হইয়াও কিছুই করিতে পারিলেন না কেন ? ইহার কারণ কি ? কারণ

এই যে, সরলা যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, ততদিন এ দেশে গৃহের বাহিরে নারীদিগের কোনরূপ কর্ম্মক্ষেত্রই ছিল না; তাই তিনি কোন মহৎ কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে পারেন নাই। তাহা ছাড়া সরলার বয়স অল্প, জীবনের অভিজ্ঞতাও অতি সামান্য; অথচ সঙ্কোচ ও ভয় যে তাঁহার নিতান্ত কম ছিল, তাহাও নহে। সেইজন্য তাঁহাকে কোন উচ্চ কাজের কথা বলিলে তিনি লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতেন; বলিতেন, "নিশ্চয়ই এইরকম ভাল কাজ করিতে আমার ইচ্ছা হয়; কিন্তু শক্তি কোথায়? আমার ইচ্ছা আছে, কিন্তু শক্তি নাই।"

সরলার আত্মশক্তির প্রতি কেমন একটা অবিশ্বাস ছিল। তাই তিনি আপনার দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়াছেন—"আমি ফরাসী ভাষা হইতে যে বইখানি ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছি, তাহা পাঠ করিয়া সতীশ অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমার অনুবাদটি খুব ভালই হইয়াছে। আমি কি গর্ব্বিতা! সামান্য একটু প্রশংসাতেই আমার হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত এবং সেই সময়ের জন্য আমার মন অহঙ্কৃত হইয়া উঠে। তবে আমার এই ভাব নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। একটু পরেই আমি এ সকল বিস্মৃত হইয়া যাই, এবং আমার চির-অভ্যস্ত আত্মশক্তির প্রতি যে নির্ভরহীনতা, তাহাই জয় লাভ করে। যদিও বাল্যকাল হইতে জর্জ্জ ইলিয়টের উল্লিখিত "অদৃশ্য গায়ক দলের" সঙ্গে যোগ দিবার জন্য আমার উচ্চাভিলাষ; তবুও কখনই মনে হয় না যে, আমি কোনও মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি। এই যে আত্মশক্তির প্রতি অবিশ্বাস, ইহাই আমার জীবনের এক ভয়ানক দোষ। এই অবিশ্বাস আমার বড়ই অনিষ্ট করিতেছে। কিন্তু কিছুতেই উহার হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা করিতে পারিতেছি না। ঈশ্বর আমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করুন এবং আমার জীবনকে এই পৃথিবীতে থাকিবার উপযুক্ত করিয়া তুলুন।"

সরলার স্বামী লিখিয়াছেন, "সরলা প্রতিকূল সমালোচনাকে বড়ই ভয় করিতেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইবার পূর্ব্বেই তিনি যদি কোন কার্য্যে হস্তার্পণ করেন, আর যদি সেই কার্য্যটির দোষত্রুটি দেখিয়া লোকেরা তীব্র সমালোচনা করে, তবে সেই সমালোচনার ভয়ে সমস্ত জীবনে আর কোনই বড় কাজ করিতে সমর্থ হইবেন না। সুতরাং প্রথমে তিনি শিখিবেন, কাজের জন্য প্রস্তুত হইবেন, তাহার পরে কোন ভাল কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।"

৪

সরলার একদিকে মহত্ত্বের প্রতি অনুরাগ ও মহৎ কার্য্য করিবার জন্য প্রাণের ব্যাকুলতা, অন্যদিকে অন্তরের সরলতা এবং ছেলেমানুষের মত একটি হাসিখুসী ভাব থাকায়, আমরা তাঁহার কাছে গিয়া বড়ই সুখী হইতাম। তিনি তাঁহার উষার ফুলের মত নির্ম্মল মুখখানিতে শুভ্র হাসি হাসিয়া, যখন আমাদের নিকটে আসিতেন, তখন তাঁহাকে কি সুন্দরই দেখাইত! তাঁহার চোখে মুখে যেন সরলতার স্বচ্ছ আভা এবং পবিত্রতার অপূর্ব্ব মাধুরী বিকশিত হইয়া উঠিত। সরলার এই সরলতা ও হৃদয়ের পবিত্রতাসম্বন্ধে তাঁহার স্বামী লিখিয়াছেন—"তিনি নির্ম্মল কাচখণ্ডের ন্যায় পবিত্র ছিলেন। সংসার তাঁহাকে কিছুমাত্র অপবিত্র করিতে. সমর্থ হয় নাই। সংসারের ধূর্ত্ততা, প্রবঞ্চনা ও নিকৃষ্টভাবসম্বন্ধে পূর্ব্বে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। বিবাহের পরে বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সঙ্গে মিশিয়া মানুষের শঠতা ও মন্দ ভাব অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু মানবহৃদয়ের

স্বাভাবিক সাধুতার প্রতি তাঁহার এমনই বিশ্বাস ছিল যে, কেহ কোন ব্যক্তির কুকার্য্যের উল্লেখ করিলে, সহজে তিনি তাহা বিশ্বাস করিতে চাহিতেন না। বলিতেন, "ঐরকম কথা কেন বলিতেছেন? অমন খারাপ কাজ কি মানুষ করিতে পারে?"

বিবাহের পরেও সরলার কি রকম ছেলেমানুষের মত হাসিখুসী ভাব ছিল, সে বিষয়ে একটি কথা বলিতে চাই। সরলার বিবাহ হওয়ার অনেক দিন পরে, আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। প্রথমেই তাঁহার স্বামী সতীশরঞ্জন দাস মহাশয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হইল; সরলা নিজেই আলাপ করাইয়া দিলেন। অল্পকাল কথাবার্ত্তার পরে, সরলার একখানা ফটোর দিকে আমার চোখ পড়িল। আমি বলিলাম, "ফটোখানা ত মন্দ হয় নাই।" সরলা কহিলেন, "ওখানা কি ভাল হইয়াছে? আমাকে যে বড় বোকা মেয়ের মত দেখাচ্ছে! দেখুন, এ বিষয়ে আপনাকে আজ একটা মজার কথা বলিব। বিবাহের পরে আমি আমার বোনদের সঙ্গে—বাড়ীতে গিয়াছিলাম। আমরা যখন চলিয়া আসিলাম, তখন সে বাড়ীর একটি স্ত্রীলোক আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—'এই মেয়েটি দুর্গামোহন বাবুর পুত্রবধূ হইয়াছে? মেয়েটিকে দেখিয়া যে বোকা বলিয়া মনে হয়। ওর চেয়ে ওর বোনেরাই ত বেশ চতুর চালাক ও বুদ্ধিমতী।' তখন আর একটি মেয়ে বলিয়া উঠিলেন—'বউটি যে বি, এ, পাশ করিয়াছে।' এই কথা শুনিয়া সেই স্ত্রীলোকটি বলিলেন, "বটে! তাই নাকি? তবে ত মেয়েটি বোকা নয়।"

শুনিয়া আমি খুব হাসিতে লাগিলাম। তাহার পরে আমি যখন চলিয়া আসিব, তখন সরলা ক্ষুদ্র বালিকার মত আব্দার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখুন, আজ আমাকে একটা গল্প শুনাইতেই হইবে। নইলে আপনাকে ছাড়িব না।" আমি বলিলাম, "এখন ত তুমি আর সেই

দার্জ্জিলিঙ্গের বালিকা সরলা নও; এখন যে তুমি বড় হইয়াছ, বি, এ, পাশ করিয়াছ; এ বয়সে আর কি গল্প শুনিবে?"

সরলা কহিলেন, "না, না, সে হইবে না; গল্প একটা শুনাইতেই হইবে। আপনি এখন বাঁকিপুর গিয়া, সেখানকার বোর্ডিংয়ের ছেলেদের পাইয়া আমাদের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। এই ত কত মাস পরে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন।"

আমাকে বাধ্য হইয়া রবীন্দ্রনাথের একটি ছোট গল্প সরলাকে শুনাইতে হইল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, এখনো সরলার সেই ছেলেবেলার সরলতা যেমন তেমনই রহিয়া গিয়াছে।

সরলার কোমল হৃদয় দয়ায় পূর্ণ ছিল। মানুষের দুঃখ দেখিলে তাঁহার বড়ই কষ্ট হইত। তিনি অল্প বয়সে যখন কিছুদিন দার্জ্জিলিং ছিলেন, তখন এক অন্ধ ভিখারীকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "আহা, বেচারার কি কষ্ট! আমি বড় হইয়া যদি টাকা উপার্জ্জন করি, তবে নিশ্চয়ই দুঃখীদের খুব দান করিব।" আমাদের একটি বন্ধু বলিলেন, "যখন বড় হইবে, তখন আর এ কথা মনেও থাকিবে না।"

কিন্তু সরলা বড় হইয়াও লোকের দুঃখকষ্ট দেখিয়া নিতান্ত উদাসীন থাকিতে পারেন নাই। তিনি প্রত্যেক পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়াছেন। সেই বৃত্তির পরিমাণ এক হাজার টাকার বেশী বই কম নয়। অথচ সরলা নিজের জন্য ঐ টাকার কিছুই খরচ করেন নাই। অধিকাংশ টাকার দ্বারাই গরীব ছাত্র ও ছাত্রীদের সাহায্য করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ছাত্রদিগের বন্ধু "পণ্ডিত-মহাশয়" নামে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে সরলার খুব আলাপ পরিচয় ছিল। আমি জানি, সরলা দরিদ্র ছাত্রদিগের সাহায্যের জন্য প্রতি মাসেই কেদার বাবুর হস্তে কিছু কিছু টাকা দিতেন। সরলার বি, এ, পরীক্ষার পরে যখন তাঁহার নিজের হাতে আর টাকা রহিল না,

তখন তিনি কেদার বাবুকে তাঁহার মাতার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাঁহার মাতা কেদার বাবুর হস্তে কিছু কিছু অর্থ অর্পণ করিতেন। সরলার এই দান সম্বন্ধে তাঁহার স্বামী লিখিয়াছেন—

"সরলা অতিশয় লজ্জাশীলা ছিলেন। তাঁহার দানের বিষয় প্রকাশ হইলে বড়ই লজ্জিত হইতেন। এজন্য তিনি গোপনে দরিদ্রদিগকে দান করিতেন। বৃত্তির দ্বারা প্রায় এক সহস্র টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই টাকার একটি পয়সাও নিজের জন্য ব্যয় করেন নাই। আমি শুনিয়াছি যে তাঁহার একজন শিক্ষকের অভাবের সময় বৃত্তির টাকা হইতে তিনি দুইশত টাকা দান করিয়াছিলেন।

"আমি বার বার দেখিয়াছি, অপরের ক্লেশ নিবারণ করিবার জন্য কখনো কখনো তিনি আপনার হৃদয়ের ভাব সংযত ও মনের ইচ্ছাকে চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন। মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে, তাঁহার এক আত্মীয়া অর্থাভাবে একটি বিবাহে যৌতুক দিতে পারিতেছিলেন না। যৌতুক না দিলে হয় ত পাত্রী তাহা মনে করিয়া রাখিবেন। সরলা স্বয়ং সেই পাত্রীকে উপহার দিবার জন্য একটি জিনিস ক্রয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঐ রকম জিনিস আর একটি যে তিনি ক্রয় করিবেন, এমন শক্তি তাঁহার ছিল না। তবুও তিনি তাঁহার জিনিসটি অম্লানচিত্তে সেই আত্মীয়াকে প্রদান করিলেন; নিজে তিনি উপহার দেওয়ার আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইলেন।"

সরলা যতদিন এই পৃথিবীতে ছিলেন, ততদিন তাঁহার স্বামীর ব্যারিষ্টারি কার্য্যের পসার যে খুব বেশী হইয়াছিল, তাহা নয়। এজন্য সরলার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অধিক অর্থ দান করিয়া দুঃখীর দুঃখভার লাঘব করিতে পারেন নাই। তাই এখন আমার শুধু মনে হয়, হায়! আজ যদি সরলা এই সংসারে থাকিতেন, তাহা হইলে স্বামীর এডভোকেট জেনারেলের পদ গ্রহণ, প্রতি মাসে হাজার হাজার টাকা

উপার্জ্জন এবং তৎসঙ্গে তাঁহাকে মুক্ত হস্তে অর্থ বিতরণ করিতে দেখিয়া কতই সুখী হইতেন। কেন যে সরলা অকালে এই পৃথিবী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, আজ কে আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিবে?

সরলা শৈশবকাল হইতে পাশ্চাত্য ভাবের মধ্যে বর্দ্ধিতা হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু নারীপ্রকৃতির স্বাভাবিক লজ্জা তাঁহার যথেষ্ট ছিল। তিনি যাঁহাদিগের সঙ্গে মিশিতেন, ঠিক আপনার লোক মনে করিয়া নিঃসঙ্কোচে তাঁহাদের সঙ্গে মিশিতেন, যাঁহাদিগকে ভালবাসিতেন, তাঁহাদিগকে আত্মীয় মনে করিয়া কত কথাই বলিতেন, কত সময় ছেলে মানুষের মত কত আব্দার করিতেন; অথচ তাঁহার মধ্যে শোভন লজ্জার ভাবটি অতি সুন্দররূপেই দেখা যাইত। আমি ত সরলার হাস্য কৌতুকের মধ্যেও তাঁহাকে কখনই চপল হইতে দেখি নাই। চপলতা হয় ত তিনি ভালই বাসিতেন না। তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, "মেয়েরা যে কথায় কথায় হাসে আর ঠাট্টা করে, আমার কিন্তু তাহা খুব ভাল লাগে না। তবে দুঃখ এই যে, ঐ রকম হাসি ঠাট্টার মধ্যেই অনেক সময় আমাকে থাকিতে হয়। আমার বন্ধুরা যদি আমার সঙ্গে কোনও মহৎ বিষয়ে কথা বলেন, তাহা হইলে আমার বড় আনন্দ হয়।"

সরলার হাসিখুসী ভাবের মধ্যেও একটি গাম্ভীর্য্য দেখিতে পাইতাম; উহা দেখিয়া অন্তরে অত্যন্ত শ্রদ্ধার উদয় হইত।

ধর্ম্মসম্বন্ধে সরলা আপনার মনের কথা খুলিয়া বলিতে লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেন। তাঁহার ধারণাই ছিল যে, তিনি ধর্ম্মবিষয়ে বিশেষ কিছুই জানেন না। কিন্তু আবার আমরাও জানি, ঈশ্বরের উপাসনার প্রতি তাঁহার অন্তরের অটল শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল। তিনি যখন কাহারো উপাসনায় যোগদান করিতেন, তখন তাঁহার প্রাণে একটি সহজ ও স্বাভাবিক ধর্ম্মভাবেরই স্ফূরণ হইত। সরলা প্রতিদিনই

রাত্রে ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে কিছু পড়িয়া এবং ঈশ্বরের নিকট একটি প্রার্থনা করিয়া শয়ন করিতেন। সরলার দৈনন্দিন লিপি পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, তাঁহার গোপন-মর্ম্মস্থানে প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাস প্রচ্ছন্ন ছিল। আমি তাঁহার দৈনন্দিন লিপির কয়েকটি স্থান হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"This love is wholly selfish and is no love at all, since it does not smite the chord of self and make it pass out of sight but only strikes it out louder and brings it more into prominence. I don't think I was so selfish before. Now I want Satish to think of me and love me and me alone and no one else. I sometimes feel afraid when I think that this morbid love I have for S. will make me forget everything and every body and God will be displeased and take him away from me. Oh God, I cannot think of it. As I am writing, my eyes are filling. Oh God, I hope Thou wilt moderate my love and make it pure and holy and just what Thou wouldst like it to be. Oh God, help me to love Thee and be of some use to Thee."

"আমার (স্বামীর প্রতি) এই ভালবাসা সম্পূর্ণরূপে স্বার্থে পরিপূর্ণ ; ইহা প্রকৃত ভালবাসাই নয়। কারণ, ইহা আমার আমিত্বের তন্ত্রীকে ছিন্ন করিয়া দেয় না ; আমিত্বকে দৃষ্টির বহির্ভূত করিয়া রাখে না। বরং আরো উচ্চ হইতে উচ্চতর স্বরে আমিত্বের তন্ত্রীকে বাজাইয়া তোলে। আমার মনে হয় না যে, আমি আগে এমন স্বার্থপর ছিলাম। এখন ইচ্ছা করি, সতীশ শুধু আমাকেই ভালবাসুন, আমারই চিন্তা করুন, আর কাহারো নহে। সময় সময় আমার এ কথা মনে করিয়া ভয় হয় যে, সতীশের প্রতি আমার এই যে অন্যায় ভালবাসা, ইহার জন্য আমি আর সকল বস্তু ও সকল মানুষকে ভুলিয়া যাইব ; তখন ঈশ্বর আমার

প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইবেন। উঃ! ঈশ্বর, আমি এই কথা ভাবিতে পারি না। লিখিতে লিখিতে অশ্রুতে আমার চক্ষু পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। হে প্রভু, আমি আশা করি, তুমি আমার ভালবাসাকে সংযত ও পবিত্র করিবে। এই ভালবাসা, তুমি যেরূপ হওয়া মনে কর, সেইরূপ করিয়া দাও। হে ঈশ্বর, তোমাকে ভালবাসিতে এবং তোমার কোন কাজের উপযুক্ত হইতে আমাকে সাহায্য কর।"

এই দৈনন্দিন লিপির ফুটনোটে সতীশরঞ্জন লিখিয়া রাখিয়াছেন, "সরলার স্বামীর প্রতি ভালবাসা এতই অধিক ছিল যে, সেজন্য সর্ব্বদাই তাঁহার অন্তরে অত্যন্ত ভয় হইত। ভয় এইজন্য যে, পাছে বা তাঁহার এই ভালবাসার নিমিত্ত, ঈশ্বরের প্রতি যে ভালবাসা, তাহা চলিয়া যায়। কিন্তু সরলার জীবনে এরূপ কখনই হয় নাই।"

সরলার দৈনন্দিন লিপির এই চিত্তাকর্ষক বর্ণনাটি পাঠ করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার স্বামীর প্রতি কি সুগভীর প্রেম! আর সেই সঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি কি স্বাভাবিক ও সুপবিত্র ভালবাসা! আমরা ত জানি, যে নারী প্রাণের সমস্ত প্রেম দিয়া স্বামীকে ভালবাসিতে পারেন, তিনি পতিব্রতা, তিনি সৌভাগ্যবতী। কিন্তু সরলা আপনাকে সৌভাগ্যবতী মনে করা দূরে থাকুক, বরঞ্চ এই ভালবাসাকে অন্যায় মনে করিয়া, ভয়ে আকুল হইয়া ঈশ্বরের চরণে ক্রন্দন করিতেছেন এবং স্বামীর চেয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসিবার ও তাঁহার প্রিয় কাজ করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন।

সরলার দৈনন্দিন লিপির অন্য একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন—"অন্তর্জ্জগতের কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিলে আমরা পুনঃ পুনঃ সতর্কতার বাণী শুনিতে পাই। কিন্তু তাহাতে কর্ণপাত না করিলে সে বাণী ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যায়, পরে আর সে বাণী শ্রুতিগোচর হয় না। আমাদিগের ধ্বংসই তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল।"

অন্যত্র—"আমার সম্বন্ধে আমি এই বলিতে পারি যে, আমার বড় অহঙ্কার। আমি সহজেই উত্তেজিত হই। সুখদুঃখের সময়ে ঈশ্বরের উপর নির্ভর রাখিতে পারি না। অনেক সময় সত্য সত্যই আমি সরলভাবে বিশ্বাস করি, ঈশ্বর আমার প্রতি অত্যন্ত দয়া প্রকাশ করিয়াছেন; আমি এই দয়ার উপযুক্ত পাত্রী নই। কিন্তু যখন অন্তরে অবসাদ ও অশান্তি আসে, তখন আমার কৃতজ্ঞতার ভাব হ্রাস হয় এবং আমার মনে যেন বিদ্রোহের ভাবই জাগিয়া উঠে।"

সরলা অত্যন্ত সরলভাবেই আপনার জীবনের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়, তাঁহার অন্তরে অকৃত্রিম ধর্ম্মভাব প্রচ্ছন্ন ছিল। তাহা ছিল বলিয়াই তিনি ব্রাহ্মসমাজকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। মিষ্টার সতীশরঞ্জন দাস লিখিয়াছেন, "সরলার মনের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, যখন তাঁহার স্বামী ব্যারিষ্টারী কার্য্যে প্রতিপত্তি লাভ করিবেন এবং যখন তিনি আপনাকে কোন মহৎ কাজের উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবেন, তখন তিনি ব্রাহ্মসমাজের কোন উন্নত কাজের সঙ্গে যুক্ত হইতে চেষ্টা করিবেন।" কিন্তু সরলার মনে এইরূপ উচ্চ আকাঙ্ক্ষা থাকিলে হইবে কি? বিধাতার ইচ্ছা যে অন্যরূপ! কে জানে স্বর্গে তাঁহার কি প্রয়োজন হইয়াছিল, তাই তিনি এই সুন্দর পুষ্পটিকে অকালে সংসারবৃন্ত হইতে ছিন্ন করিয়া আপনার নির্ম্মল হস্তেই গ্রহণ করিলেন।

জানি না সরলার ভিতরে কি রকম একটি পবিত্র আকর্ষণী শক্তি প্রচ্ছন্ন ছিল। তাই তাঁহার সঙ্গে কয়েক দিন আলাপ করিলেই অন্তরে একটি স্নেহের উদয় হইত, তাঁহাকে বড়ই ভাল লাগিত। এই জন্য সরলার সঙ্গে যাঁহাদের আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল, তাঁহারা প্রায় সকলেই সরলার অত্যন্ত প্রশংসা করেন। এ বিষয়ে এই জায়গায় আমি দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। কবি নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় সম্পর্কে

সরলাদের অতি আত্মীয় ছিলেন। তিনি যখন কুমিল্লার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, আমি তখন দেশপ্রসিদ্ধ কবি বলিয়া তাঁহার সঙ্গে একদিন দেখা করিতে গিয়াছিলাম। উহার কিছু দিন পূর্ব্বেই "নব্যভারতে" সরলার ক্ষুদ্র একটি জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছিল। নবীন বাবু যখন শুনিলেন, আমিই ঐ জীবন চরিতটির লেখক; তখন আনন্দে আপ্লুত হইয়া আমাকে বলিলেন, "আপনিই ঐ জীবনচরিত লিখিয়াছেন? তবে ত সরলার উপরে আপনারও অতিশয় স্নেহ ছিল। সরলা আমার বড়ই স্নেহের পাত্রী ছিলেন; তাঁহার মৃত্যুর জন্য আমি অন্তরে অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করিতেছি। সরলা যে কি রকম ভাল মেয়ে ছিলেন, তাহা আর আপনাকে কি বলিব?" আমার কথাটা প্রকাশ করিতে বড় সঙ্কোচ বোধ হয় যে, আমি সরলার জীবনচরিত বিষয়ে একটি তুচ্ছ রচনা লিখিয়াছি বলিয়া, নবীন বাবু স্বরচিত বইগুলি আমাকে উপহার দিবার জন্য, কলিকাতায় তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশকের নিকট একখানি চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন। সরলার উপরে তাঁহার এমনই একটি আন্তরিক স্নেহ ছিল।

সরলার শিক্ষয়িত্রী শ্রদ্ধেয়া কবি কামিনী রায় বি-এ, তাঁহার এই পরম স্নেহের ছাত্রীটিকে যে কিরূপ আশ্চর্য্যভাবে ভালবাসিতেন, সে বিষয়ে পূর্ব্বেই আমি অনেক কথা বলিয়াছি। সম্প্রতি তিনি অনুগ্রহ করিয়া একখানি চিঠিতে সরলার বিষয়ে কিছু লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। সেই সুন্দর চিঠিখানির অধিকাংশ কথাই নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। পাঠকেরা উহা পড়িলেই অনুভব করিতে পারিবেন যে, সরলা ভক্তি ও মধুর ব্যবহারের দ্বারা তাঁহার এই শিক্ষয়িত্রীকে করূপ আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। কবি লিখিয়াছেন—

"সরলার সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া দিবার জন্য বার বার অনুরুদ্ধ হইয়াও আমি এ পর্য্যন্ত কিছু লিখিতে পারি নাই। ইহার কারণ ভাল করিয়া কিছু বলিবার অক্ষমতা। তাহাকে যেমনটি দেখিয়াছি ঠিক তেমন

করিয়া দেখাইতে পারিব না। তদ্ভিন্ন আর একটি বাধাও আছে। তাহার কথা বলিতে গেলে নিজের কথাও অনেক বলিতে হয়। তাহা ইচ্ছা করে না। আবার অনেক ছোট খাটো ঘটনা যাহার বর্ণনায় তাহার স্বভাবসুন্দর সরল জীবনের ছবি সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিত, তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। কেবল মনে আছে তাহার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ।

"তাহার পিতা যখন রেঙ্গুন হইতে আসিয়া তাহাকে ও তাহার আর দুইটি ভগিনীকে বেথুন স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া গেলেন, জানি না কেন তিনি সরলাকে বিশেষ ভাবে আমার হাতে দিয়া গিয়াছিলেন। বোধ হয় প্রথম দর্শন হইতেই সরলা আমাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল বলিয়া। বাঙ্গালীর মেয়ে, বাঙ্গলা লিখিতে পড়িতে জানে না; কথা-বার্ত্তায় চালচলনে বেশভূষায় সম্পূর্ণ বিদেশী; তাহাকে ভাল করিয়া বাঙ্গলা শিখাইতে ও বাঙ্গালী করিতে হইবে। সে তখন দশ এগার বৎসরের বালিকা। আমি তখন শিক্ষকতা করিতাম, কিন্তু তাহার মত ছোট মেয়েদের ক্লাসে নহে। ছাত্রীদের পড়াশুনা ভিন্ন অন্যান্য বিষয়েও কিছু কিছু তত্ত্বাবধান করিতাম, তবে ছাত্রীনিবাসে আমার বিশেষ কর্ত্তৃত্ব কিছু ছিল না। তবু ছাত্রীসাধারণের আমি প্রিয় ছিলাম। আমার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ, আমার হস্তাক্ষরের অনুকরণে লেখা ও আমার কাজকর্ম্ম করিয়া দেওয়া বিষয়ে কয়েকটি বালিকার মধ্যে যেন বেশ একটু প্রতিযোগিতা চলিত। সরলা আসিয়া আমার ভক্তের সংখ্যা বাড়াইল। কিন্তু অন্যদের হইতে তাহার ব্যবহার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। অন্যদের মত দূরে থাকিয়া সভয়ে সসম্ভ্রমে সে চলিত না। সে বলপূর্ব্বক আমাকে অধিকার করিয়া বসিল। আমি যেন তাহার অতি আপনার লোক। গুরুর প্রতি শিষ্যের ভক্তি ও আনুগত্য কেবল নহে, তাহার ছিল জ্যেষ্ঠা সহোদরার উপর কনিষ্ঠার স্থির স্নেহ, ক্ষমা ও ধৈর্য্যের দাবী। সে যখন তখন আসিয়া গলা জড়াইয়া ধরিত এবং আমার নিকট

আদর চাহিত। তাহাকে আমার ঘরে কোন পুস্তক আনিতে পাঠাইলে, সেই অবসরে সে গৃহে-রক্ষিত টিনের দুধ (Condensed milk তাহার বড় প্রিয় ছিল) খাইয়া আসিত এবং ফিরিয়া আসিয়া মুখের দিকে চাহিয়া হাসিত। নিজেদের ঘরের কথা, পরের কথা সব বলিত; আমার মনের ভিতর উঁকি দিয়া ভিতরের চিন্তা জানিতে চাহিত। তাহাকে একেবারে আপনার জন না করিয়া নিস্তার ছিল না।

"আমার পিতৃদেব তাহাকে আদর করিয়া 'আমার চতুর্থ কন্যা' বলিতেন, কিন্তু সে অনেক কাল পরের কথা।

"মাঝে সে একবার স্কুল ছাড়িয়া গিয়াছিল, তখন আমার চিঠিগুলি বহু যত্নে সঙ্গে রাখিত। দ্বিতীয় বার ফিরিয়া আসিলে তাহার পিতা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সরলা দ্বিতীয় ভাষা বাঙ্গলা লইয়া এণ্ট্রান্স দিতে পারিবে ত? আমি বলিলাম নিশ্চয় পারিবে। তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মেধার পরিচয় আমি যথেষ্ট পাইয়াছিলাম।

"সে যে আবেষ্টনের মধ্যে জন্মিয়া পরিবর্দ্ধিত হইতেছিল, তাহার ভিতরে থাকিয়া জ্ঞানের স্পৃহা ও ভোগে নিস্পৃহতা, একটি উন্নত লক্ষ্যের দিকে চলিবার আকাঙ্ক্ষা সচরাচর জন্মে না; জন্মিলেও ধনী-দুহিতার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় না, ইহাই দেখিয়া আসিতেছি। সরলাতে এই নিয়মের আশ্চর্য্য ব্যতিক্রম দেখিলাম।

"দ্বিতীয় বার আসিয়াই সে প্রশংসার সহিত এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। ইহার পরে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে কি তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে—আমার ঠিক মনে নাই—তাহাকে আমার বাঙ্গলা পড়াইতে হইল। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্তের 'উপাসক সম্প্রদায়' ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া তাহাকে বুঝাইতে হইত। এই সময়ে তাহার সহিত নানা বিষয়ে আলোচনা করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বেই তাহার জন্য স্কুল কলেজের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যের বাহিরের পঠনীয় বিষয় নির্ব্বাচনের

ভার সে আমাকে দিয়াছিল। আমিও যেখানে যাহা ভাল পাইয়াছি তাহাকে পড়িতে দিয়াছি বা নিজে পড়িয়া শুনাইয়াছি। তাহাকে আমার প্রিয় পুস্তক সকল পড়াইয়া, তাহার আগ্রহপূর্ণ সহানুভূতি-ভরা মুখশ্রী দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি।

"কাহাকেও কিছু পড়াইয়া এত সুখ আমি আর কখনও পাইয়াছি কি না ঠিক বলিতে পারি না। যাহা আমার প্রিয় তাহা সে নিজের প্রিয় করিয়াছিল, যাহা আমার মন্ত্র তাহা তাহারও মন্ত্র হইয়া উঠিল। এ কথা পরে জানিতে পারিয়াছি। নিকটে থাকিতে তাহার আকাঙ্ক্ষার গভীরতা বালিকাসুলভ বাহ্য চপলতায় অনেক সময় ঢাকা থাকিত।

"প্রবেশিকা পরীক্ষায় বালিকাদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া সে অনেকগুলি পারিতোষিক পায়। ইহার মধ্যে 'কেশবচন্দ্র সেন পারিতোষিকের' মূল্য ১০০৲ এক শত টাকা। সে ইহার অর্দ্ধেক ও অন্যান্য পারিতোষিকের নির্দ্ধারিত মূল্য দিয়া পুস্তক ক্রয় করিয়া দিতে বলিল। ৫০৲ টাকা নগদ পাইয়া কোন অনাথাশ্রমে দান করিল। কি কি পুস্তক সে পারিতোষিক পাইবে তাহা নির্ব্বাচনের ভার আমাকে দিল। তদনুসারে আমি একটি তালিকা করিয়া দিলাম। পারিতোষিক বিতরণের দিনের স্মৃতি এখনও আমার উজ্জ্বল আছে। দীর্ঘ করতালির মধ্যে সরলা দুই তিন বার গিয়া পুস্তকগুলি বহন করিয়া আনিয়াছিল। লর্ড এলগিন (Lord Elgin) তাঁহার অভিভাষণে বলিলেন, কোন কোন বালিকা এত অধিক সংখ্যক পুস্তক পাইয়াছে যাহা একটি উত্তম লাইব্রেরীর ভিত্তি হইতে পারে। (Would form the nucleus for a good library)

"সরলার মধ্যে পারিবারিক-কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা ও পিতৃ মাতৃ ভক্তি তাহার বাল্যকাল হইতেই দেখিয়াছি। আমি ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি সে ঘরের কথা বলিত। তাহা বলিত বটে কিন্তু সব কথা নহে। এ বিষয়ে

তাহার সরলতার সঙ্গে আশ্চর্য্য বুদ্ধিমত্তা ও বাকসংযমের পরিচয় পরে পাইয়াছি।

"আমার বিবাহের কিছুদিন পূর্ব্বে সে আমার কাছে আসিয়াছিল। আমার বস্ত্রালঙ্কার দেখা, আমার ভাইকে সাহায্য করা, ক্রমে আমার সমুদয় জিনিসপত্র সাজাইয়া গুছাইয়া দেওয়া, যৌতুকাদি তুলিয়া রাখা—এ সমস্ত কাজ আমার পিতার চতুর্থ কন্যার মতই করিয়া গিয়াছে। এই সময় কাজের ভিড়ে একদিন সে যে আঘাত পাইয়াছিল তাহার জন্য অনেক দিন কষ্ট পাইয়াছে। যে দিন তাহাকে ফেলিয়া চলিলাম সে দিন সে কত ব্যথিত হইতেছিল তাহাও মনে আছে।

"আমার বিবাহের পর সুবিধা হইলেই সে আমার কাছে আসিয়াছে। একবার গ্রীষ্মাবকাশে তাহাকে আমি আমার বাড়ীতে আসিয়া ছুটি কাটাইতে অনুরোধ করি। একলা আসিলে তাহার একটি ভাই ও একটি ভগিনী পাছে মাতাকে তাহার অনুপস্থিতিতে অস্থির করিয়া তোলে এই ভয়ে সে তাহাদিগকে সঙ্গে আনিবার অনুমতি চাহিল। ভাই ভগিনীর শাসন ও পালনের ভার তখন সে নিজে লইয়াছিল।

"তাহার বিবাহিত জীবন নিজের গভীর ভালবাসা দিয়া সে মধুময় করিয়াছিল। কিন্তু আমার সঙ্গে তাহার সম্পর্ক কোন দিন বিচ্ছিন্ন হয় নাই। তাহার অকাল মৃত্যুর সংবাদ আমাকে বড়ই অভিভূত করিয়াছিল।

"আমি তাড়াতাড়ি এইটুকু লিখিলাম। আমার শরীর খুব সুস্থ নহে।

বিনীতা
কামিনী রায়
১৭।২।২৩"

আমরা অগ্রেই বলিয়াছি, সরলার মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহার অল্প একটু জ্বর হইত। কিন্তু কয়েক দিন পরেই তিনি আরোগ্য লাভ করেন। অবশেষে একদিন অর্থাৎ ১৯০১ সালের ২৮শে নবেম্বর বেলা সাড়ে নয়টার সময়ে হঠাৎ তাঁহার পেটে ভয়ানক একটা বেদনা আরম্ভ হয়। এই সাংঘাতিক বেদনায় রাত্রি সাড়ে নয়টার সময়েই তিনি ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে কলিকাতার অনেক খ্যাত-নামা চিকিৎসক ডাকান হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহাদের চিকিৎসায় কিছুই হইল না। সরলা এগার ঘণ্টা পর্য্যন্ত অতিশয় ধৈর্য্যের সহিত এই বেদনা সহ্য করিয়া, সংসারের নিকট তিনি চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন।

সরলার মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া, তাঁহার পরিচিত লোকদিগের মধ্যে অনেকেই দুঃখ প্রকাশ করিয়া সতীশরঞ্জন দাস মহাশয়ের নিকট বিস্তর চিঠি লিখিয়াছিলেন। ঐ সকল চিঠির মধ্যে সরলার অনেক সদ্গুণের উল্লেখ ছিল। আজ সেই চিঠিগুলি সংগ্রহ করিতে পারিলে, তন্মধ্যে সরলার জীবনচরিত রচনা করার অনেক উপকরণ পাওয়া যাইত। আমরা উহার পরিবর্ত্তে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বাংলা ও ইংরাজী সংবাদ পত্র "তত্ত্বকৌমুদী" ও "ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার" হইতেই সরলার জীবনসম্বন্ধে গুটিকয়েক কথা উদ্ধৃত করিয়া, এই রচনাটি সমাপ্ত করিতেছি।

"অনেকে মনে করেন, উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত মহিলারা সাংসারিক কাজের অযোগ্যা হইয়া থাকেন। তিনি (সরলা) স্বীয় জীবনে এই অভিযোগের অসারতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি অতি সুগৃহিণী ছিলেন। যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে মিশিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার মধুর চরিত্রে মুগ্ধ হইয়াছেন। সমাজের ও দেশের সেবা করিবার জন্য তাঁহার প্রাণে প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি মেসেঞ্জার পত্রিকাতে সময় সময় লিখিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে অনেক আশা ছিল।"

তত্ত্বকৌমুদী, ১লা পৌষ, ১৮২৩ শক।

"Their married life was the very happiest possible. Mr. Das found in her a friend and a counsellor of rare judgment. Highly educated as she was, she was an excellent housewife, and in her short life gave a concrete refutation of the charge that high education unfits women for domestic duties. When her husband was pushing his difficult way in the Calcutta Bar, she encouraged him in his difficulties and disappointments. She was by nature retiring. But to the small circle of her friends she was the very emblem of courtesy, kindness and amiability. She always longed to be of some service to her country and church ; and deplored that there was no field for her work. She was an occasional contributor to the Indian Messenger and the Mukul. Mrs. Das was only twenty three at the time of her death. In her we have lost a promising young lady and an ardent member of the Brahmo Samaj. We do not know what words of consolation to offer to her bereaved husband, and parents except that she is happy in the land where she has passed, and that they have our sincerest sympathy in their grief. May God almighy give them grace and strength to bear their loss."

Indian Messenger.

8th December, 1901.

আতরমণি দেবী

১

আতরমণি দেবী কলিকাতা সহরের অতি সম্ভ্রান্ত ধনীর গৃহের পুত্র-বধূ ছিলেন। অতি অল্প বয়সেই তাঁহার পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছিল। সেজন্য তিনি আর অধিক লেখাপড়া শিক্ষা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার অবস্থার পরিবর্ত্তনে, তিনি যখন যথেষ্ট স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন, তখনও স্বাভাবিক লজ্জা ও অত্যন্ত নম্র ভাবের জন্য বাহিরের কোন মহৎ কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তবুও আতরমণি দেবীর অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তিই তাঁহার জীবনকে অতিশয় উন্নত করিয়া তুলিয়াছিল। এই ধর্ম্মশীলা নারী লজ্জা ও সঙ্কোচের জন্য অতি অল্প লোকের সঙ্গেই মিশিতেন, অতি অল্প লোকই তাঁহাকে খুব ভাল করিয়া জানিতেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে উত্তমরূপে জানিতেন, তাঁহারাই তাঁহার জীবনের সৌন্দর্য্যে, প্রকৃতির মাধুর্য্যে ও সুমধুর বাক্যালাপে আকৃষ্ট হইতেন; তাহা ছাড়া এই কোমল হৃদয়া নারীর বিনয় ও নম্র ভাবের সঙ্গে, সংকল্পের দৃঢ়তা, ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুলতা, সাধনের জন্য আগ্রহ ও ভক্তিপূর্ণ ভাবোচ্ছ্বাস লক্ষ্য করিয়া, তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। আমার আনন্দের বিষয় এই যে, আমি আতরমণি দেবীকে জানিতাম, তাঁহার ধর্ম্মভাব লক্ষ্য করিতাম, তাঁহার প্রতি আমার একটি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল। সেই জন্যই তাঁহার মৃত্যুতে ব্যথিত হইয়া এই ক্ষুদ্র জীবনচরিতটি লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

বাংলা ১২৭২সালে হাওড়া জেলার অন্তর্গত বালুহাটি গ্রামে আতর-মণি দেবী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী মহাশয়

সেই সময় ঐ পল্লীগ্রামেই বাস করিতেন। তাহার পরে তিনি ভবানীপুর বেলতলা-বকুল-বাগানে বাটী নির্ম্মাণ করেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় সেই স্থানেই পুত্রকন্যাদিগকে লইয়া অবস্থিতি করিতেন। তিনি সংযত চরিত্র, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও নিষ্ঠাবান ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। তাঁহার অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরের প্রতি অন্তরের অটল বিশ্বাস ছিল; তাই চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিয়মিতরূপে আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে ব্রহ্মোপাসনা ও প্রত্যহ শ্রদ্ধার সহিত উপনিষদ পাঠ করিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার আশ্চর্য্য নিষ্ঠা দেখা যাইত। এইরূপ সাত্ত্বিক প্রকৃতি ও ব্রহ্মোপাসক পিতার কন্যা বলিয়াই হয় ত পরিণত বয়সে আতরমণি দেবীর হৃদয় অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। তাঁহাকে লাভ করিবার জন্যই তাঁহার নারীপ্রকৃতি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে বৎসর ভবানীপুরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন, সেই বৎসরই তাঁহার কন্যার বিবাহ ঠিক্ হইয়া গেল। তখন আতরমণি দেবীর বয়স বার বৎসর মাত্র। এই বয়সে তাঁহার রূপ ও গুণ উভয়ই তাঁহাকে সুপাত্রী করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি দেখিতে অতিশয় সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার উজ্জ্বল গৌর বর্ণ এবং পবিত্রতার আভায় ও সরলতায় মণ্ডিত সুন্দর মুখখানি নিরীক্ষণ করিয়া সকলেই তাঁহাকে রূপসী বলিয়া মনে করিত। বুঝি বা পাত্রীর এই দেহের লাবণ্য ও অন্তরের সদ্গুণের জন্যই কলিকাতার এক বনেদি ঘরের একটি অতি উত্তম পাত্রই জুটিয়া গেল। পাত্রটি যথার্থই সুপাত্র বটে। তিনি ধনীর ছেলে, বয়সেও তরুণ, দেখিতেও সুন্দর; তাঁহার স্বভাবচরিত্রও খুব ভাল; পড়াশুনাতেও যথেষ্ট মনোযোগ;—এরূপ ভাল বর পাওয়া কন্যার সৌভাগ্যের বিষয় বই আর কি? আতরমণির স্বামী রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স তখন ষোল বৎসর মাত্র। তাঁহার

পিতার মৃত্যু হইয়াছিল; সেই জন্য মাতাঠাকুরাণীই সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন। কর্তৃত্ব করিবার মত শক্তি তাঁহার যথেষ্টই ছিল। তিনি রূপে গুণে সকল বিষয়ে আপনার মনের মত বধূটিকে পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। নববধূর গৃহে আগমনের পরে, কর্ত্রীঠাকুরাণী আনন্দোচ্ছ্বাসে কয়েক দিন ধরিয়া উৎসব করিতে লাগিলেন। এমন কি, তিনি স্নেহের আবেগে বধূর নামটি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে করুণাময়ী বলিয়া ডাকিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু শাশুড়ীর চেষ্টা সত্ত্বেও বধূ নূতন নামে লোকের চিত্ত আকৃষ্ট করিতে পারেন নাই, তিনি পুরাতন আতরমণি নামেই আত্মীয়স্বজনের নিকটে সুপরিচিতা ছিলেন। তবে করুণাময়ী নামটিতে তাঁহার দয়াপ্রবণ হৃদয়ের ভাবটি যে ঠিক প্রকাশ পাইত, সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। শাশুড়ী মনের স্ফূর্ত্তিতে এতটা অগ্রসর হইলেন যে, বধূকে কিছু লেখাপড়া শিখানোও তাঁহার আবশ্যক বলিয়া মনে হইল। তাঁহার ছেলের বন্ধু শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়কে বধূর শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। অথচ শিক্ষক নিজেই বয়সে অত্যন্ত তরুণ।

২

আতরমণি দেবীর অল্প বয়সেই, কোমল মনোবৃত্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মভাবেরও উন্মেষ হইয়াছিল। তাঁহার বালিকাহৃদয় নির্ম্মল পুষ্পের মতন অতিশয় পবিত্র ছিল। এখন তিনি কলিকাতার নিষ্ঠাবান্ হিন্দু পরিবারে আসিয়া পড়িলেন। নিষ্ঠাবতী শাশুড়ীর সুশিক্ষায় তাঁহার অন্তরে হিন্দুসমাজের সাত্ত্বিকভাবই প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত দেবার্চ্চনা, ব্রতপালন ও

পুরাণাদি শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সে বিষয়ে তাঁহার শৈথিল্য দূরে থাকুক, বরং একান্ত ব্যাকুলতাই লক্ষ্য করা যাইত। অথচ তাঁহার চোখের সাম্‌নেই ধর্ম্মকে বিস্মৃত হইয়া থাকিবার মতন প্রচুর সুখ ও যথেষ্ট আমোদ প্রমোদের আয়োজন ছিল।

আতরমণি শাশুড়ীর ত আদরের পাত্রী ছিলেনই; তাঁহার কাছে বাস করিয়া আপনাকে অত্যন্ত সুখী মনে করিতেন। তাহা ছাড়া আপনার মনের মতনই রূপগুণসম্পন্ন শিক্ষিত স্বামী পাইয়াছিলেন। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হইয়াছিল। দুজনেই দুজনকে সমস্ত মনপ্রাণ অর্পণ করিয়া ভালবাসিতেন এবং নিরন্তর সুখী করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। পতিব্রতা নারীর এই স্বামীসৌভাগ্য দর্শন করিয়া, আত্মীয়-স্বজনদিগের মনে হইত, শুভক্ষণেই আতরমণি দেবীর জন্ম। তাঁহারা অনেকেই এই সুলক্ষণা ও সৌভাগ্যবতী বধূর সাত্ত্বিক ভাবে ও সুমিষ্ট ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন; বলিতে কি, পাড়া-প্রতিবেশীর মুখে বধূর প্রশংসা আর যেন ধরিত না।

আতরমণি দেবীর দুইটি কন্যা ও একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের যেমনই সুন্দর চেহারা, তেমনই মধুর প্রকৃতি; তাহারা পিতা মাতার হৃদয় প্রীতি ও পুলকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছিল। এই সময়ে আতরমণি দেবী ও তাঁহার স্বামীর কোন রকম পার্থিব সুখেরই যেন অপ্রতুল ছিল না। মানুষ সচরাচর যে অর্থ, সম্মান ও অপত্যের কামনা করে, এই দুই পতি-পত্নীর সে সকলই লাভ হইয়াছিল।

এই সুখী পরিবারে ১২৯৮ সালে হঠাৎ মৃত্যু আসিয়া হাত বাড়াইয়া দিল; আতরমণি দেবীর শাশুড়ী পরলোকে প্রস্থান করিলেন। তাই ধনীর সংসারের সমস্ত কর্ত্তৃত্বভার বধূর হস্তে অর্পিত হইল। ঐ সময়ে তাঁহার বয়স ছাব্বিশ বৎসর মাত্র। অথচ তিনি বর্ষীয়সী নারীর ন্যায় একান্ত নিষ্ঠার সহিত ধনীর গৃহের পূজার্চ্চনা,

অনুষ্ঠান ও উৎসব সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন করিতেন। এই সকল কার্য্যে তাঁহার নব্য ভাবাপন্ন স্বামী কিঞ্চিৎ উদাসীনই ছিলেন। সেই জন্যই বাড়ীর প্রত্যেকটি ধর্ম্মকার্য্যে তাঁহাকে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিতে হইল। ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের প্রতি তাঁহার অন্তরের অচলা ভক্তি ছিল। তিনি সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়াকর্ম্মে ও ব্রত-অনুষ্ঠানে তাঁহাদিগকে অর্থাদি দান করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিতেন। আত্মীয় স্বজনদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া নানা রকম উপাদেয় সামগ্রী খাওয়াইতেও তাঁহার উৎসাহের সীমা ছিল না। দরিদ্র ও দুঃখীদিগের কষ্ট ও অভাবের কথা তিনি কোন দিনই ভুলিয়া থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার দয়াপ্রবণ হৃদয়ই তাঁহাকে দুঃখীর দুঃখ দূর করিবার জন্য উত্তেজিত করিয়া তুলিত। তিনি যেদিন মৃত্যুশয্যায় শায়িতা, সেদিনও একটি দুঃখিনী নারীর দুঃখ লাঘবের জন্য স্বামীকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিলেন। সে কথা আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করিতে চেষ্টা করিব।

আতরমণি দেবীর এইরূপে দিনগুলি কাটিয়া যাওয়ার পরে, যেন শুভক্ষণেই বাংলা ১৩০৪ সাল আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ সালের পৌষ মাসে আতরমণি দেবী বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য গিরিডি গমন করিলেন। তাঁহার স্বামী রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সঙ্গেই ছিলেন। ১২৯৯ সাল হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই শীতকালে তিনি পত্নী-পুত্র-কন্যাদিগকে লইয়া গিরিডি আসিতেন। এ বৎসর গিরিডি-ব্রাহ্মসমাজের অতি নিকটেই একটি উৎকৃষ্ট বাড়ী তাঁহাদের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। তাঁহারা মনের আনন্দে সেই সুন্দর বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। তৎপূর্ব্বে রামলাল বাবু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচালিত আদি ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনায় গমন করিতেন। তিনি নিজেই একজন সঙ্গীত-রসগ্রাহী-গায়ক। সঙ্গীত তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় সামগ্রী। হয় ত বিশুদ্ধ তান-লয়-যুক্ত সঙ্গীত শ্রবণই তাঁহার আদি ব্রাহ্মসমাজে

যাইবার প্রধান কারণ ছিল। কিন্তু আতরমণি দেবী কলিকাতার রক্ষণশীল হিন্দুপরিবারের কুলবধূ, দেবার্চ্চনায় তাঁহার অটল নিষ্ঠা, ব্রাহ্মণপণ্ডিতের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা. তিনি ত সরল বিশ্বাসে দেবদেবীর অর্চ্চনা করিয়াই আপনার নারীহৃদয়ের ধর্ম্মতৃষ্ণা চরিতার্থ করিতেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি কেন, কোন সমাজেরই উপরে কোন দিনই তাঁহার কোন রকম অশ্রদ্ধা ছিল না, সে রকম অনুদার শিক্ষাই তাঁহার নয়। তিনি কাহাকেও কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে দেখিলে কোমল অন্তরে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিতেন। কিন্তু তাহা বলিয়া ব্রাহ্মসমাজের উপরে যে মনের কোন রকম টান ছিল, তাহাও ত নহে। সত্য বটে, তাঁহার পিতা ব্রহ্মোপাসনা করিতেন, শৈশবকালে সে দৃশ্যও তাঁহার চোখে পড়িত। কিন্তু চোখে তাহা পড়িলেই বা কি? তিনি ত সেই ব্রহ্মোপাসনার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। তবে তখন হইতেই এক বিচিত্রকর্ম্মা পুরুষের অদৃশ্য হস্ত গোপনে পিতার আধ্যাত্মিক ভাবের দ্বারাই যে কন্যার ধর্ম্মজীবনের সূচনা করিতেছিলেন, সে বিষয়েও আমাদের কোন সন্দেহ নাই। সেই ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ নিশ্চয়ই জানিতেন, এই আতরমণি দেবী পিতার পার্থিব সম্পদের অধিকারিণী হইবেন না বটে, কিন্তু ধর্ম্মসম্পদ তিনিই প্রাপ্ত হইবেন।

তাহাই ত হইল। আতরমণি দেবীর গিরিডি অবস্থান করিবার সময়ে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইতেছিল। রামপুরহাট প্রবাসী সুগায়ক রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপূর্ব্ব গীতধ্বনিতে উপাসনামন্দির মধুময় হইয়া উঠিয়াছিল। সেই প্রাণস্পর্শী সঙ্গীতের স্বরলহরী ধর্ম্মপ্রাণা আতরমণি দেবী এবং তাঁহার সঙ্গীতজ্ঞ স্বামীর কর্ণে আসিয়া পৌঁছিতেছিল। তখন পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বসু মহাশয় ভিন্ন অন্য কোন ব্রাহ্মই গিরিডি সহরে বাস



আতরমণি দেবী

করিতেন না। শুধুই কয়েক জন ব্রাহ্মভাবাপন্ন লোক লইয়া তিনকড়ি বাবু উৎসাহের সহিত উৎসব সম্পন্ন করিতেন। ঐ সকল ভদ্রলোক হারমনিয়ম বাজাইবার জন্য রামলাল বাবুকে ব্রহ্মমন্দিরে আহ্বান করায় তাঁহাকে গিরিডি-ব্রাহ্মসমাজে গমন করিতে হইল। তিনি ইতিপূর্ব্বে আর কখনই সাধারণ কি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যোগদান করেন নাই, অদ্য এই ব্রাহ্মসমাজের প্রাতঃকালের উপাসনায় যোগদান করায় তাঁহার অন্তরে এক নূতন ভাব তরঙ্গিত হইয়া উঠিল; সঙ্গীত, সংকীর্ত্তন ও ব্রহ্মোপাসনা তাঁহার অতিশয় মিষ্ট লাগিল এবং হৃদয় স্পর্শ করিল। তিনি আপনার অন্তরের কথা সহধর্ম্মিণীর নিকট গোপন রাখিতে পারিলেন না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই দেবতা-ব্রাহ্মণে-ভক্তিপরায়ণা, হিন্দুগৃহের কুলললনা নিঃসঙ্কোচে ব্রহ্মোৎসবের রাত্রিকালীন উপাসনায় যোগদান করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন; আজীবনের প্রাচীন সংস্কার তাঁহার চিত্তের উপরে কোনরকম আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিল না। উপাসনায় যোগ দিবার জন্য সেই সাধ্বী-স্ত্রীর প্রাণের একান্ত আগ্রহ দর্শন করিয়া রামলাল বাবু কোনরকম বাধা ত দিলেনই না; বরং তিনি হৃষ্টমনে পত্নীকে লইয়া ব্রাহ্মসমাজে গমন করিলেন। তখন গিরিডির সমাজ-মন্দির অতি ক্ষুদ্র একখানি খোলার ঘর মাত্র। সেই ঘরেই ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় বেদীতে বসিয়া উপাসনা করিতেছিলেন, গায়ক রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরিমোহন ঘোষাল মহাশয়ের সঙ্গীত লহরী যেন ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়া যাইতেছিল। সেই শুভমুহূর্ত্তেই দুই পতিপত্নীর হৃদয়ের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। স্বয়ং ঈশ্বরই যেন অকস্মাৎ তাঁহাদের অন্তরে কি এক শক্তি সঞ্চার করিলেন। তাহাতেই দুজনের হৃদয়ের রহস্যদ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল। তখন দুজনেই বিচিত্র মনোরাজ্যে এমন কিছু

দর্শন করিলেন, প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরের এমন এক অপূর্ব্ব স্পর্শ লাভ করিলেন যে, তাঁহাদের চিত্ত অভিনব ভক্তির উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা এক অজ্ঞাত পুরুষের ইচ্ছাশক্তির অধীন হইয়াই ব্রাহ্মসমাজকে বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত হইলেন। এ বিষয়ে শ্রদ্ধাস্পদ রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বয়ং লিখিয়াছেন—"উপাসনায় আমরা পতি-পত্নী দুজনেই একই সময়ে একটু যে কি স্পর্শ পাইলাম, কি রকম যে হইয়া গেলাম, তাহা জানি না; তাহা ভাষায় ত বর্ণনা হয় না। আমরা দুজনেই অশ্রুপাত করিতে করিতে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। প্রায় সমস্ত রাত আমি আমার সহধর্ম্মিণীকে ব্রহ্মসঙ্গীত শুনাইতে লাগিলাম। তখন আদি ব্রাহ্মসমাজের কয়েকটি সঙ্গীত ছাড়া আমার অন্য গান জানা ছিল না।"

৩

আতরমণি দেবী ও তাঁহার স্বামী সেই যে গিরিডির ব্রহ্মোৎসবে ঈশ্বরের একটু আভাস প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার প্রেমের একটু স্পর্শ লাভ করিলেন, আর ত সেই শুভমুহূর্ত্তের কথা ভুলিয়া যাইতে পারিলেন না। ভুলিয়া যাওয়া ত দূরের কথা; সেই যে উৎসবের রাত্রে আত্মার অতি রহস্যময় প্রদেশে এক অভিনব আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, উহাই তাঁহাদের অন্তরের উপরে যেন মায়া বিস্তার করিল। তাঁহারা আত্মবিস্মৃত হইয়া, অজানা পথের যাত্রীর মতন যেন সেই অজ্ঞাত পুরুষের অভিমুখেই যাত্রা করিলেন। দুজনে এই সময় হইতেই ঈশ্বরের আরাধনা, ধ্যান ও প্রার্থনাসমন্বিত যে অমৃতময় উপাসনা, উহা অবলম্বন করিয়া যথার্থ ধর্ম্মজীবন লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া

উঠিলেন। এই সময় হইতেই প্রতি সপ্তাহে ব্রাহ্মসমাজে যাইবার জন্য তাঁহাদের মনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল।

অবশেষে দুই পতি-পত্নী কলিকাতায় স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তখন আত্মীয় স্বজনের শত চক্ষু তাঁহাদের উপর পতিত; নিন্দা এবং নির্য্যাতনের কতই ত আশঙ্কা; কিন্তু তবুও তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের গায়ক ও আচার্য্যদিগকে গৃহে আহ্বান করিয়া, তাঁহাদের উপাসনা ও সঙ্গীতে আগ্রহের সহিত যোগদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তাহার অতি অল্পদিন পরেই কলিকাতায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসব আরম্ভ হইল। সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে এই ব্রহ্মোৎসব এক স্বর্গীয় ব্যাপার। মাঘের ১লা তারিখ হইতে প্রায় পনের ষোল দিন প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে সুবৃহৎ ব্রহ্মমন্দিরে সঙ্গীত, সঙ্কীর্ত্তন, উপাসনা, বক্তৃতা ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ হইতে থাকে। সহরের বিস্তর পুরুষ ও নারী সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া উৎসবের আনন্দ উপভোগ করিতে থাকেন। এমন কি, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পঞ্জাব, বেহার এবং বাংলাদেশ ও আসামের নানা জায়গা হইতে অনেক পুরুষ ও মহিলা ধর্ম্মের জন্য তৃষিত হইয়া ঐ সময়ে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন; এবং উৎসাহের সহিত উৎসবে যোগদান করেন। শুধু যে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত লোকেরাই এই উৎসবে উপস্থিত থাকেন, তাহা নহে; হিন্দু, মুসলমান, ও খ্রীষ্টান সমাজেরও অনেক ভক্ত এই উৎসবে আগমন করিয়া ঈশ্বরের নামের বিমল আনন্দ উপভোগ করেন। উৎসবের মধ্যে আবার ১১ই মাঘ একটি বিশেষ দিন। সেদিন প্রভাতকালের পূর্ব্বেই, রাত্রি চারিটা বাজিতে না বাজিতে উৎসবমন্দিরে লোকসমাগম হইতে থাকে; তখনই গায়কগণ সুকণ্ঠে সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হন। তাহার পরে সাতটার সময়ে যখন উৎসবের উপাসনা আরম্ভ হয়, তখন কাহার সাধ্য যে ভিড় ঠেলিয়া মন্দিরে প্রবেশ করে?

আর প্রবেশ করিলেই বা কি হইবে? একটু জায়গা থাকিলে ত! আমি যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় জীবিত; তিনি ১১ই মাঘের আচার্য্যের আসনে উপবিষ্ট হইয়া, অন্তরের উচ্ছ্বসিত ভক্তির আবেগে যখন উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তখন শত শত নরনারীর অন্তরে যেন এক স্বর্গীয় বৈদ্যুতিক শক্তি প্রবাহিত হইয়া যাইত; শত শত নরনারীর ব্যাকুল চিত্ত ভাবোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইয়া উঠিত; ঐ সময়ে ব্রহ্মমন্দিরে যে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখা যাইত, তাহা কি জীবনে আর কখনো বিস্মৃত হইতে পারিব?

আতরমণি দেবী এই এগারই মাঘের উৎসবে যোগদান করিবার নিমিত্ত, গাড়ীতে স্বামীর সঙ্গে মন্দিরের সম্মুখে ত আসিলেন; কিন্তু গিরিডির মতন এখানে সঙ্কোচ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। এখানে তিনি ধনীর গৃহের বধূ, শত প্রকারের সামাজিক বন্ধনের মধ্যে তাঁহার বাস; তাহা ছাড়া চোখের সাম্‌নেই যেন পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মেলা! উত্তম পরিচ্ছদে সুশোভিতা ও সুশিক্ষিতা শত শত ভদ্র মহিলার এরূপ আশ্চর্য্য মিলন তিনি ত আর কোন দিনই দর্শন করেন নাই। এই সকল কারণে এই উৎসবমন্দিরের যাত্রিণী লজ্জায় আর গাড়ী হইতে নামিতে পারিতেছিলেন না। তখন আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের ভগিনী শ্রদ্ধেয়া সুবর্ণপ্রভা বসু তাঁহাকে গাড়ী হইতে নামাইলেন। আতরমণি দেবী তাঁহার সঙ্গেই উৎসব-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তখন পূর্ব্বাকাশে অরুণের লোহিত আভাও পড়ে নাই, বিহঙ্গের গীতধ্বনিতেও চারিদিক মধুময় হইয়া উঠে নাই; তরুণ যুবকেরা রাত্রি জাগিয়া বিবিধ পুষ্প পত্রে যে ব্রহ্মমন্দির সুসজ্জিত করিয়াছেন, তাহারই কোন কোন কুসুমের সুগন্ধ অন্তরে অন্তরে পুলক জাগাইয়া তুলিতেছিল। ঈশ্বরের নামের মধুর গীতধ্বনি শুনিতে শুনিতে বিস্তর পুরুষ ও নারীর নয়ন হইতে ভক্তির অশ্রু দুই গণ্ডে

গড়াইয়া পড়িতেছিল। সেই দৃশ্য দর্শন করিয়াই আতরমণির সুকুমার হৃদয় ভাবে বিগলিত হইয়া গেল। তাহার পরে আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এক স্বর্গীয় আধ্যাত্মিক শক্তিতে হৃদয় পূর্ণ করিয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন; তখন শত শত পুরুষ ও নারীর প্রাণের ভাব উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; যাঁহারা স্বভাবতই অত্যন্ত ভাবপ্রবণ, তাঁহাদের ক্রন্দনে এবং "ওঁ ব্রহ্ম" ধ্বনিতে উৎসবমন্দির কম্পিত হইতে লাগিল। স্বভাব-সরলা ও স্বাভাবিক ধর্ম্মতৃষ্ণায় তৃষিতা আতরমণি দেবী আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না; ভক্তির অশ্রুতে তাঁহার নীলোৎপল নেত্রদ্বয় সিক্ত হইয়া গেল। উৎসবের উপাসনা শেষ হইল, তবুও তাঁহার আর গৃহে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল না। এই যে ১১ই মাঘের ব্রহ্মোৎসব তাঁহার জীবনে প্রভাব বিস্তার করিল, ইহার পরে তিনি এই মহোৎসবের দিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ব্রহ্মমন্দিরে আসিতেন আর রাত্রি দশটার পরে গৃহে ফিরিয়া যাইতেন। সেদিন কোথায় বা থাকিত তাঁহার আহার, কোথায় বা থাকিত তাঁহার বিশ্রাম! অধিকাংশ সময় অনাহারে ও সাত্ত্বিকভাবে উৎসবের সঙ্গীত এবং উপাসনার মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া, তাঁহার জীবনদেবতা ঈশ্বরেরই অতুলনীয় করুণা উপভোগ করিতেন। অধিক বয়সে যখন তাঁহার শরীর অসুস্থ, তখনো ১১ই মাঘের উৎসবের দিনে, পুত্রকন্যাগণ জেদ করিয়াও তাঁহার মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে পারেন নাই। হিন্দুসমাজের শিক্ষা ও সংস্কারের জন্য এমনই একটি নিষ্ঠা ও সাত্ত্বিক ভাব তাঁহার জীবনে লক্ষ্য করা যাইত।

দিনের পরে দিন আতরমণি দেবীর ও তাঁহার স্বামীর হৃদয়মন ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িতে লাগিল। তাঁহারা সম্ভ্রান্ত এবং উচ্চ বংশের ব্রাহ্মণ; কলিকাতার প্রাচীন সমাজে তাঁহাদের কত শত বৎসরের সম্মান ও মর্য্যাদা; ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলে সে সম্মান ও প্রতিপত্তি চলিয়া যাইবে, আত্মীয় স্বজনের অবজ্ঞার তলে বাস করিতে

হইবে, কত দুঃখ ও নির্য্যাতনে দেহমন অবসন্ন হইয়া পড়িবে; সে সকল চিন্তাই তাঁহাদের অন্তরে প্রবল হইয়া উঠিল। সাধারণতঃ এইরূপ চিন্তায় পুরুষের চিত্ত দৃঢ় থাকিলেও রমণীর মন ভাঙ্গিয়া পড়ে। কিন্তু এক অভিনব আধ্যাত্মিক শক্তিতে আতরমণির নারী-হৃদয় এমনই সবল হইয়া উঠিল যে, ঐ সকল আশঙ্কা ও ভয় সেই ধর্ম্মিণীর আত্মার প্রবল গতিকে বাধা দিয়া ফিরাইতে পারিল না; বরং তিনি স্বয়ং স্বামীকে সাহস দিয়া, দুজনেই হাত ধরাধরি করিয়া, ঈশ্বরের করুণার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর রাখিয়া, সবল পদক্ষেপে ব্রাহ্মসমাজের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই সময় হইতেই আচার্য্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, বয়োবৃদ্ধ গুরুচরণ মহলানবিশ, সুগায়ক হরিমোহন ঘোষাল প্রভৃতি নিমন্ত্রিত হইয়া আতরমণি দেবীর গৃহে গমন করিতেন। সেখানে উপাসনা, সঙ্গীত এবং ধর্ম্মপ্রসঙ্গ হইত। দুই পতি-পত্নী উহাতে যোগদান করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিতেন।

অবশেষে আতরমণি দেবী ও রামলাল বাবু ব্রাহ্মসমাজের সংস্রব হইতে আর অধিক দূরে বাস করিতে সমর্থ হইলেন না। সেই স্মরণাতীত কালের প্রাচীন ঋষিদিগের সাধনলব্ধ এবং ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনা, উদার ও উন্নত ধর্ম্মমত, বর্ত্তমান কালের উপযোগী সামাজিক রীতিনীতি তাঁহাদের অন্তরে যেন কুহক বিস্তার করিল এবং তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজেই লইয়া আসিল। আমি ভাবিয়া বিস্মিত হই যে, সরলচিত্ত ও শুদ্ধ-চারিণী ব্রাহ্মণকন্যা আতরমণি দেবী এতদিন যে সংস্কারের বশবর্ত্তিনী হইয়া, আপনার দেহমনের পবিত্রতা রক্ষার জন্য নিম্নজাতির সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকিতেন, এখন তিনিই কোন জাতিকে অস্পৃশ্য মনে ভাবিয়া ঘৃণা করা অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া বুঝিলেন এবং অম্লানবদনে ও

অকুণ্ঠিতচিত্তে জাতিভেদ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার কোন রকম পূর্ব্ব সংস্কার ও সমাজভয় মুসলমানের অন্নগ্রহণেও বাধা দিতে সমর্থ হইল না।

এ দেশের অনেক উচ্চ শিক্ষিত লোকেরও মনের ধারণা এই যে, যে-সে মানুষ নিরাকার অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারে না; আমরাও কত সময় মনে ভাবি, উৎকৃষ্টরূপে জ্ঞানালোচনা না করিলে, দর্শনের অন্ততঃ মোটামুটি কথাগুলি জানা না থাকিলে, কিরূপে ঈশ্বরের স্বরূপসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিব? কিরূপেই বা আরাধনা ও ধ্যানের জটিল রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করিব? কিন্তু আতরমণি দেবী উচ্চ শিক্ষায় সুশিক্ষিতা না হইয়াও উন্নত ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হন নাই। এই রচনার মধ্যে পুনঃ পুনঃ তাঁহার যে স্বাভাবিক ধর্ম্মতৃষ্ণার উল্লেখ করিব, এবং তিনি যে প্রত্যহ অশ্রুসিক্ত নয়নে ঈশ্বরের স্তবস্তুতি করিতেন, পরবর্ত্তী সময়ে, গৃহকার্য্যের মধ্যেও অনবরত গুণ্ গুণ্ করিয়া যে দয়াময়ের নামের মধুমাখা সঙ্গীত গাহিতেন, তাহাতেই সেই বিশ্বের বরণীয় দেবতার অসীম করুণার উদ্রেক হইয়াছিল; সেই করুণাতেই আতরমণি দেবী অনন্তস্বরূপের আরাধনা ও ধ্যানের রহস্য কথা অতি উত্তমরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অবশেষে যতই তিনি স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ হৃদয় ও প্রাণভরা ধর্ম্মপিপাসা লইয়া উপাসনার মধুর ভাবের ভিতর মগ্ন হইতে লাগিলেন, ততই ভক্তির সুধারসে তাঁহার আত্মা সিক্ত হইতে লাগিল।

কে না জানে এই বিপদসঙ্কুল সংসারে একখানির পরে আর এক খানি পা ফেলিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে হইলে, মনের মত সাহায্যকারী বন্ধুর কতই প্রয়োজন। কিন্তু হায়, সেই মনের মানুষ কোথায়, যিনি প্রাণভরা প্রেম লইয়া আত্মার অতি নিকটে আসিয়া, দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে শক্তি দান করিতে ও আনন্দের সময়ে তিনিও আনন্দে আপ্লুত হইতে পারেন? এইরূপ ধর্ম্মবন্ধু দুলভ হইলেও, ঈশ্বরের করুণায় কলিকাতা সাধনাশ্রমের পরম শ্রদ্ধার পাত্রী চঞ্চলা দেবী, আতরমণির হৃদয়ের অতি কাছে আসিয়া একখানি ভালবাসার আসনই অধিকার করিলেন। এই স্নেহময়ী ও মনস্বিনী নারীকে জীবনের শুভমুহূর্ত্তে বন্ধুরূপে পাইয়া তাঁহার প্রাণের প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি চঞ্চলা দেবীকে ভগিনীরূপে, গুরুরূপে বরণ করিয়া লইয়া, তাঁহারই সাহায্যে আপনার আত্মার অভাব পূর্ণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে চঞ্চলা দেবী প্রায়ই সাধনাশ্রম হইতে আতরমণির গৃহে গমন করিতেন। তাঁহার প্রাণস্পর্শী উপাসনা, সরস ধর্ম্মালোচনা ও প্রাণমাতানো সঙ্গীত, সেই ধর্ম্মশীলা নারীর মনোমধ্যে যেন এক নিগূঢ় আধ্যাত্মিক শক্তি বিকশিত করিয়া তুলিত।

তুলিবারই কথা; কারণ, চঞ্চলা দেবী পরকে ঘরের লোক করিয়া, সুমধুর স্নেহে ও সুমিষ্ট ধর্ম্মালাপে, সহজেই মানুষের মনটি আকৃষ্ট করিতে পারিতেন। তাঁহার পরিচিত লোকেরা সকলেই জানেন, সে বিষয়ে তাঁহার একটি বিশেষ ক্ষমতা ছিল। তিনি পাটনায়, ঢাকায় ও শ্রীহট্টে—যেখানেই গিয়াছেন, সেইখানেই অনেক সরলচিত্ত ধর্ম্মপিপাসু পুরুষ ও নারী তাঁহার উপাসনা, সঙ্গীতে ও ধর্ম্মালোচনায় অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছেন। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, আমিও এই মনস্বিনী

নারীর স্নেহের অল্পাংশ গ্রহণ করিয়াছি। তিনি কত লোককেই স্বহস্তে উপাদেয় সামগ্রী সকল রান্না করিয়া খাওয়াইতেন; কতদিন আমিও তাঁহার স্নেহ-হস্তের অন্ন ও মিষ্টান্ন গ্রহণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। আমরা একসঙ্গেই কত দিন সাধনাশ্রমে উপাসনা, সঙ্গীত ও ধর্ম্মালোচনা করিতাম। "প্রেমানন্দে রাখ পূর্ণ আমার দিবস রাত" এই সঙ্গীতটি, তিনি কণ্ঠস্বর সপ্তমে তুলিয়া গাইতে গাইতে যখন ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেন, তখন আমাদের আত্মা সেই সঙ্গীতের সুধারসের মধ্য দিয়া ঈশ্বরের যে একটি মধুর স্পর্শ লাভ করিত, তাহা কি জীবনে কখনো ভুলিতে পারিব? তিনি পদস্থ রাজকর্ম্মচারীর পত্নী ছিলেন। তাঁহার শিক্ষা অতি সামান্যই ছিল; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার মনের শক্তি যে নিতান্ত সামান্য ছিল, তাহা নহে। উচ্চ শিক্ষার সুযোগ হইলে, নিশ্চয়ই তিনি কোন না কোন কার্য্য করিয়া যশস্বিনী হইতেন। তরুণ বয়সেই ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহার জীবনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তিনি বিধবা হইবার কয়েক বৎসর পরে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত সাধনাশ্রমে প্রবেশ করেন। ধর্ম্মসাধন এবং ব্রাহ্মসমাজের সেবায় জীবন সমর্পণ করাই তাঁহার সুপবিত্র জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এই লক্ষ্য চোখের সম্মুখে রাখিয়াই তিনি নিরন্তর উপাসনা, সঙ্গীত, বিস্তর ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, সাধ্যানুসারে লোকের সেবা এবং অনেক পরিবারে গমন করিয়া লোকের অন্তরে সরস ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিতে চেষ্টা করিতেন। আমরা তাঁহাকে মেজদিদি বলিয়া ডাকিতাম এবং বড় বোনের মতই তাঁহার উপরে অন্তরের একটি শ্রদ্ধা ছিল। বলিতে দুঃখ হয়, অনেক দিন হইল, তিনি কালের আহ্বানে এ লোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন।

এই চঞ্চলা দেবী ও আতরমণির মধ্যে ক্রমশঃই আত্মার একটি নিগূঢ় সম্পর্ক মধুরতর হইয়া উঠিল। তাঁহারা দুজনে এক সঙ্গে মিলিত

হইলে, প্রায়ই উপাসনা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত করিতেন। তখন মধুর উপাসনায় দুজনেরই হৃদয়ের প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। তাঁহাদের সেই সময়ের ভক্তিবিগলিত ও অশ্রুসিক্ত মুখশ্রী দর্শন করিয়া সকলেই পুলকিত হইতেন। এ বিষয়ে রামলাল বাবু স্বয়ং লিখিয়াছেন, "চঞ্চলা দেবী তাঁহার কয়েকটি কন্যা লইয়া মধ্যে মধ্যে আমাদের গৃহে আসিয়া থাকিতেন; তাঁহাকে আতরমণি দেবী ভগিনীর মতই ভালবাসিতেন এবং গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন। এক এক দিন উপাসনার পরে দুজনে দুজনকে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেন, তখন সেই ধর্ম্মশীলা নারীর ভক্তিরঞ্জিত মুখশ্রীতে ব্রহ্মের প্রকাশের আভাস পাইয়া আমি ধন্য হইয়া যাইতাম; এবং গৃহে বসিয়া স্বর্গের ছবি দর্শন করিতাম। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে আমাদের বৈঠকখানাতে ব্রহ্মোপাসনা হইত; আমরা কয়েকজন সঙ্কীর্ত্তন করিতাম। এক এক দিন দেখিতে পাইতাম, আতরমণি বুকে দুটি হাত চাপিয়া রাখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন। সেই ক্রন্দনের জন্য এক এক সময়ে সঙ্কীর্ত্তন বন্ধ করিতে হইত।"

আতরমণি দেবীর এই সরস ও সুমিষ্ট ধর্ম্মভাবের সঙ্গে তাঁহার অন্তরে আশ্চর্য্য সাধুভক্তির বিকাশ হইয়াছিল। তিনি সকল সম্প্রদায়ের ধার্ম্মিক ও মহাপুরুষদিগকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মচরিত, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ও ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর উপদেশ, সর্ব্বত্যাগী মৌনীবাবার সাধন ও বৈরাগ্যের অপূর্ব্ব কাহিনী, মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংসের "কথামৃত" পড়িতে পড়িতে তাঁহার চিত্ত ভাবোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইয়া উঠিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি তাঁহার যে ভক্তি ছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করাও অসাধ্য। এইরূপ ভক্তি ছিল বলিয়াই তিনি নবযুগের সেই ঋষিকে স্বচক্ষে দর্শন

করিয়া, তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিলেন। রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সহধর্ম্মিণীর এই ব্যাকুলতা দর্শন করিয়া, তাঁহাকে একদিন মহর্ষিদেবের বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিলেন। মহর্ষির আধ্যাত্মিক জ্যোতিবিমণ্ডিত অনুপম মূর্ত্তি দেখিয়া এবং তাঁহার মুখের ভক্তিরসাত্মক বাণী শ্রবণ করিয়া এই বিনয়াবনতা নারী আপনার জন্ম সার্থক মনে করিয়াছিলেন। মহর্ষি যখন তাঁহার মস্তকে হস্ত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন আতরমণির মুখ অশ্রুতে আপ্লুত হইয়া গেল। তিনি নম্রভাবে মহর্ষির নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আমি শুনিয়াছি, জ্ঞানলাভ না করিলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। আমার কোনই জ্ঞান নাই; আমি কি ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারিব না?"

মহর্ষিদেব "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্", গীতার এই শ্লোকার্দ্ধ আবৃত্তি করিয়া বলিলেন—"তোমার ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা থাকিলেই তুমি তাঁহাকে লাভ করিতে পারিবে।"

মহর্ষির উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া আতরমণি দেবীর প্রাণ যেন আশায়, উৎসাহে ও নব শক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

৫

আতরমণি দেবী স্বামীর হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় মিশাইয়া দিয়া, মনের পুলকে ধর্ম্মেরই অনুসন্ধান করিতে ছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার সম্মুখে বিষম পরীক্ষা ও ভয়ানক সঙ্কট আসিয়া উপস্থিত হইল। নারীর চক্ষে এই বিপদের মূর্ত্তি কি কঠোর এবং তাঁহার পক্ষে এই পরীক্ষায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে কি দুর্জ্জয় শক্তির প্রয়োজন! কোমল-হৃদয়া আতরমণি এই সংগ্রাম ও সঙ্কটের মধ্যে যে কি করিলেন, কোন্

পথে চলিলেন, সে বিষয়ে আমি নিজে কিছু না লিখিয়া, তাঁহার স্বামীর বর্ণনা হইতেই সমস্ত কথা উদ্ধৃত করিব। তিনি লিখিয়াছেন—

"আতরমণি দেবী আমাদের গৃহে আসিয়া ধনীর ঘরের বধূর ন্যায় সাংসারিক সুখের ভিতর বর্দ্ধিতা হইয়াছেন। কিন্তু হঠাৎ নৈসর্গিক ভূমিকম্পের ন্যায় আমাদের বৈষয়িক দুর্দ্দিন আসিয়া পড়িল। আমার কারবারে দুই লক্ষ কয়েক হাজার টাকা লোকসান হওয়ায় আমি একেবারে বিপন্ন হইয়া পড়িলাম। এই সময়ে আমার জ্ঞাতি অৰ্দ্ধেক অংশীদার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া কতক সম্পত্তি বেনামী করিয়া স্ত্রীপুত্র পরিবারের সংস্থান রাখিয়া insolvency লইলেন। আমি চিরদিন কূট-বিষয়বুদ্ধি-বিশিষ্ট মামলাবাজ বলিয়া পরিচিত ছিলাম। এই বৈষয়িক দুর্দ্দিনে আমার পুরাতন শত্রু কূটবুদ্ধি আমাকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিল—আমার দুর্ব্বল মন টলমল করিতে লাগিল। তখন ধৰ্ম্মবন্ধু বটকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, স্বর্গীয় আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী, স্বর্গীয় গুরুচরণ মহলানবিশ, স্বর্গীয় প্রচারক ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ও পরলোকগত মধুসূদন সেন আমাকে লইয়া উপাসনা করিয়া সান্ত্বনা দিতেছিলেন বটে; কিন্তু তাহাতে যে প্রাণে খুব বল পাইয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। এমন সময়ে স্বয়ং ভগবান সাধ্বী আতরমণি দেবীর আত্মায় আবিভূর্ত হইয়া আমার প্রাণে ব্রহ্মশক্তি সঞ্চার করিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন—"আমরা ব্রাহ্মধৰ্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি; দারিদ্র্যকেই বরণ করিয়া লইব, কিন্তু কিছুতেই ধৰ্ম্মকে ত্যাগ করিব না। সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করিয়া যদি ঋণ শোধ না হয়, তাহা হইলে আমার যে কয়েক হাজার টাকার গহনা আছে, তাহাও আমি ঋণ শোধ করিবার জন্য তোমার হস্তেই অর্পণ করিব। তুমি কিছুই ভাবিও না, আমরা ধৰ্ম্মপথে থাকিলে স্বয়ং ভগবানই আমাদিগকে রক্ষা করিবেন।"

"ধর্ম্মপ্রাণা নারীর এই কথা ব্রহ্মবাণীর ন্যায় আমার প্রাণে শক্তি সঞ্চার করিয়া দিল ; আমার দোতুল্যমানচিত্ত স্থির সংকল্পে সবল হইয়া উঠিল ; আমি এক মহা সত্যের সাক্ষাৎ পরিচয় পাইলাম—"বলং বলং ব্রহ্মবলং"। তাহার পরে আমি সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া যে যৎসামান্য অর্থ রাখিতে পারিলাম, তাহা লইয়াই ১৯০৩ সালে কলিকাতা হইতে সপরিবারে গিরিডি আসিয়া বসবাস করিতে লাগিলাম। পূর্ব্বের তুলনায় দশভাগের একভাগ মাত্র আমাদের আয় রহিল। আতরমণি দেবীর মিতব্যয়িতা, গৃহকার্য্যে সুশৃঙ্খলা ও পরিশ্রমের জন্য, তাহাতেই শান্তিতে আমাদের দিনগুলি কাটিয়া যাইতে লাগিল। যিনি এক ঘটি জল কখনও নিজে বহন করিয়া আনেন নাই, তিনিই এই ঘোর-সংসার-সংগ্রামের ভিতর পড়িয়া প্রসন্নমুখে গুণ্ গুণ্ করিয়া ঈশ্বরের মহিমা-গীতি গাহিয়া, সর্ব্বদা গৃহকার্য্যের জন্য পরিশ্রম করিতেন। সে প্রসন্নমূর্ত্তি আমি জীবনে কখনই ভুলিতে পারিব না। তিনি শত প্রকার অসুবিধার মধ্যে পড়িয়াও, একদিনের জন্যও পূর্ব্বের সুখসম্পদ স্মরণ করিয়া হাহাকার করেন নাই এবং আমার প্রতি অনুযোগ অভি-যোগ করেন নাই। কলিকাতা হইতে আত্মীয় স্বজনেরা গিরিডির গৃহে আসিয়া আমার পত্নীকে বলিতেন, "সংসারের এত বড় একটা ভাঙ্গা-চুরা ব্যাপার হইয়া গেল, অথচ তোমাদের দেখিলে তাহার কিছুই বুঝিতে পারা যায় না।" ঈশ্বরকৃপায় আতরমণি দেবীর জীবনের শেষ কয়েক বৎসর আমাদের সাংসারিক অবস্থা ভাল হইয়াছিল। আমাদের পুত্র নরেন্দ্রের ব্যবসায়ের উপার্জ্জিত অর্থে তিনি আবার আর্থিক স্বচ্ছলতার মুখ দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র আনন্দ দেখা যায় নাই ; আতরমণির সেই ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল জীবন একই ভাবে সাগরগামিনী স্রোতস্বিনীর ন্যায় ব্রহ্মসাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছিল।"

রামলাল বাবুর এই চিত্তাকর্ষক বর্ণনাটি পাঠ করিতে করিতে চক্ষুর সম্মুখে তাঁহার পত্নীর যে চিত্রখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তাহা কি সুন্দর! তাহার কি শক্তি! আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি, আতরমণি দেবী বাহিরের ভক্তির উচ্ছ্বাসের সঙ্গে ভিতরের আত্মায় যথার্থই আধ্যাত্মিক বললাভ করিয়াছিলেন। তাই কুসুমকোমলা নারীর সবল আত্মা এই বিপদের ঝড়ে টলিল না, ভাঙ্গিয়া পড়িল না; বরঞ্চ স্বামীর দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে শক্তি দান করিয়া তাঁহাকে বলিষ্ঠ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করিয়া তুলিল। এইরূপ স্ত্রীকেই ত বলি যথার্থ সহধর্ম্মিণী ও জীবনসঙ্গিনী। নচেৎ যে নারী সুখের সময় প্রসন্নময়ী; কিন্তু বিপদের মুহূর্ত্তে দুঃখে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া স্বামীকে আরো অধিক বিপন্ন করিয়া তোলেন, তিনি আদরিণী হইতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত সঙ্গিনী ত নহেন।

আতরমণি দেবী ও রামলাল বাবুর বৈষয়িক দুর্ঘটনার জন্য, তাঁহাদের সম্মুখে যে পরীক্ষার অনল প্রজ্জ্বলিত হইল তাহা নির্ব্বাণ হইতে না হইতেই নিদারুণ শোক যেন বজ্রের মত উভয়েরই হৃদয়ে কঠিন আঘাত করিল। আতরমণির বড় আদরের কন্যা নারায়ণী অকালে পরলোকে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার সবে মাত্র একুশ বৎসর বয়স হইয়াছিল; কোলে দুইটি সুকুমার পুত্রসন্তান ছিল। তিনি স্বামীর সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। মাতার ধর্ম্মভাব ও অনেক সদ্‌গুণ তাঁহার জীবনেই লক্ষ্য করা যাইত। সেই তরুণী নারীর বিষয়ে এখানে শুধু একটি কথারই উল্লেখ করিব। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে, মাতা যখন কাছে বসিয়া প্রার্থনা করিতেছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন—"মা, আমার জীবনরক্ষার জন্য তুমি কোন প্রার্থনা করিও না, আমাকে পরলোকে লইয়া যাওয়াই যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, তবে ত সেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রার্থনা করা উচিত নয়।"

এই কন্যার পরলোকযাত্রার বিষয়ে রামলাল বাবু লিখিয়াছেন—"তাহার মৃত্যুর সময়ের দৃশ্যটি বুঝি বা কখনই বিস্মৃত হইতে পারিব না। নারায়ণীর দেহত্যাগের সময় নিকট দেখিয়া, জননী তাহার মাথাটি কোলে তুলিয়া লইয়া অনবরত ব্রহ্মনাম করিতে লাগিলেন। তখন আতরমণি দেবীর শোকাশ্রুপ্লাবিত সৌম্যমূর্ত্তি ব্রহ্মজ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া এক অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিল। এখনো আমার সেই মূর্ত্তি মনে হইলে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মবল যতই থাকুক না কেন, তিনি কোমলহৃদয়া জননী ; কন্যাবিয়োগের এই শোক সহ্য করা নিতান্ত সহজ হইল না। পূর্ব্বেই তাঁহার বহুমূত্র রোগের সূত্রপাত হইয়াছিল ; নারায়ণীর মৃত্যুর পরে সেই রোগ বৃদ্ধি হইল, শরীর ভাঙ্গিতে লাগিল। এই ভাঙ্গা শরীর লইয়াও তিনি মাতৃহীন দৌহিত্র দুটিকে বুকে করিয়া মানুষ করিতে লাগিলেন।"

আতরমণি দেবীর সম্মুখে পরীক্ষা ও সঙ্কট আর যে কখনো উপস্থিত হয় নাই, তাহা নহে। তবে এই দুইটির তুলনায় সে সকলই অতি সামান্য। কিন্তু সামান্য হইলেও আমরা এই জায়গায় তাঁহার পুত্রের বিবাহের সময়ের পরীক্ষা ও নির্যাতনের কথা সংক্ষেপে একটু উল্লেখ করিব। তাঁহারা এতদিন ব্রাহ্মদিগের সহিত মিশিতেন, ব্রহ্মোপাসনা করিতেন, সেজন্য জ্ঞাতি ও আত্মীয়েরা খুবই বিরক্ত হইয়াছিলেন। তবুও তাঁহারা এই প্রিয়জনদের হিন্দুসমাজে-থাকা-বিষয়ে একেবারে সকল আশা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। এইবার নরেন্দ্রকৃষ্ণের বিবাহে অত্যন্ত বিভ্রাট উপস্থিত হইল। এই যুবাপুরুষ আতরমণি দেবীর একমাত্র পুত্র ; অথচ ব্রাহ্মসমাজের একটি পাত্রীর সঙ্গেই ইহার বিবাহ ঠিক হইয়া গেল। পাত্রীর পিতা দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিলাতপ্রত্যাগত এবং সমাজচ্যুত ব্রাহ্ম। ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারেই বিবাহ সম্পন্ন হইবে, একজন কায়স্থবংশীয় আচার্য্য বিবাহে

পুরোহিতের কার্য্য করিবেন। আত্মীয়স্বজনের পক্ষে ইহা একেবারেই অসহনীয়। কিন্তু এ কার্য্য হইতে আতরমণি দেবীকে ফিরায় কে? তিনি ও তাঁহার স্বামী ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুভব করিয়া এই অনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছেন। হিন্দু আত্মীয়েরা বিস্তর চেষ্টা করিয়াও বিবেকপরায়ণা নারীকে তাঁহার সংকল্প হইতে টলাইতে পারিল না। তখন পত্নীর চিত্তের দৃঢ়তা দেখিয়া রামলাল বাবুও বিস্মিত হইয়াছিলেন। বিবাহের পরে যখন নির্য্যাতন আরম্ভ হইল, তখন ঈশ্বরের প্রিয়কন্যা সকলই প্রসন্নমুখে সহ্য করিলেন। হিন্দু আত্মীয়দিগের সঙ্গে এতদিন তাঁহার যে সদ্ভাব ছিল, এই ঘটনায় তাহার কোনও বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই বিষয়ে তাঁহার মন অত্যন্ত উদার ছিল।

৬

আতরমণি দেবী সর্ব্বাগ্রে যে গিরিডি সহরে ঈশ্বরের প্রেমের স্পর্শ লাভ করিয়াছিলেন, এখন সেই সহরেই তাঁহাদের স্থায়ী বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গিরিডির দূরে দূরে যে সুনীল গিরিশ্রেণী, শ্যামল বনরাজি, নিকটে যে তৃণাবৃত ধূধূ প্রান্তর, রজত বালুকারাশি পূর্ণ উশ্রী নদী এবং পুষ্পস্তবকে ও হরিদ্বর্ণ পত্র কিশলয়ে সুশোভিত তরুলতা;— সে সকলই এই ভক্তিমতী নারীর ভাবপ্রবণ অন্তরে অসীম সুন্দরের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যই উজ্জ্বল করিয়া তুলিত; তিনি প্রাণ-মন-মুগ্ধকারিণী প্রকৃতির নিকট প্রেরণা লাভ করিয়া সত্যসুন্দর পুরুষের ধ্যানেই নিমগ্ন হইতে চেষ্টা করিতেন।

আতরমণি দেবী গিরিডি ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক মণ্ডলীর একজন নিষ্ঠাবতী ও ভক্তিমতী নারী ছিলেন। শরীর নিতান্ত অসুস্থ না হইলে

তিনি প্রতি রবিবার অত্যন্ত উৎসাহের সহিত মন্দিরের সাপ্তাহিক উপাসনায় যোগদান করিতেন। অনেক সময় আমিই মন্দিরে উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করিতাম, এই জন্য আমার প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অনুগ্রহ ছিল। আমার উপাসনায় যোগদান করিয়া তিনি আনন্দ লাভ করিতেন। আমরা তাঁহাকে উপাসনায় উপস্থিত থাকিতে দেখিলে উৎসাহিত হইতাম। তাঁহার মৃত্যুতে উপাসনামন্দিরের একটি স্থান যেন চিরদিনের জন্য শূন্য হইয়া গিয়াছে। কে বলিবে, সেই ধর্ম্মশীলা নারীর আত্মা আমাদের দৃষ্টির অগোচরে তাঁহার প্রিয় উপাসনামন্দিরে উপস্থিত হইয়া শূন্য স্থান পূর্ণ করেন কি না!

আতরমণি দেবীর উপযুক্ত পুত্র এবং আমাদের স্নেহের পাত্র শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মাতার উপাসনা, গৃহকার্য্য, অপরের প্রতি স্নেহ ও সহানুভূতিবিষয়ে অনেকগুলি কথা লিপিবদ্ধ করিয়া শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে পাঠ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার সেই রচনার কয়েকটি স্থানের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এখানে প্রকাশ করিব। উহা পাঠ করিলে এই ভক্তিমতী নারীর মহত্ত্ব অল্পায়াসেই অনুভব করিতে পারিব। নরেন্দ্রকৃষ্ণ লিখিয়াছেন—

"শিশু যেমন মাকে, নামের নেশায় ডাকে," এম্নি করেই তিনি তাঁর পরম মাতাকে ডেকেছিলেন। নীরব নিস্তব্ধ গভীররাত্রে যোড়-করে উপবিষ্ট, দরবিগলিত-অশ্রুধারা-প্লাবিত অতি পবিত্র ও প্রশান্ত মাতৃমূর্ত্তি দেখে, আমার কাছে এই সঙ্গীতই মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে যে—

"বিশ্ব যখন নিদ্রামগন গগন অন্ধকার,
কে দেয় আমার প্রাণের তারে এমন ঝঙ্কার!"

"তাঁহার সহজ সরল ধর্ম্মবিশ্বাস তাঁকে অতি কঠিন, অতি সূক্ষ্ম ব্রহ্মতত্ত্বের কত উচ্চ সোপানে যে তুলেছিল, তা দেখে ব্রহ্মকৃপার যে কি অপার শক্তি, উহা অনুভব করে আশা ও বিশ্বাসে প্রাণ পরিপূর্ণ

হয়ে উঠ্‌ত। অনেক শিক্ষিতব্যক্তি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে সকল ভক্তিরসাত্মক কবিতার গভীর ভাবের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন নি, আমার মাতার কাছে ঐ সকল যখন পড়েছি, তখনি তিনি হাত দুখানি যোড় করে, চোখের জলে মুখ ও বুক ভাসিয়ে, ভক্তিরসে গলে, ভাবে বিভোর হয়ে উঠেছেন।

"তাঁর দেহ নানা রোগে ভেঙ্গে গিয়েছিল, তাঁর চিত্ত কঠোর আঘাতে ও শোকে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল; কিন্তু শয্যাশায়ী না থাক্‌লে এক দিনের জন্যও কর্ত্তব্য কার্য্যের প্রতি অবহেলা প্রকাশ করতে পার্‌তেন না। রোগে সেবা, পরদুঃখে ও বেদনায় অকৃত্রিম সহানুভূতি ও সৎকর্ম্মে উৎসাহ তাঁর যে কতই অধিক ছিল, তা যাঁরা এই পুণ্যশীলা নারীকে দেখেছিলেন, তাঁরাই জানেন। তাঁর চিত্তের প্রসার ও উদারতার কথা যখন মনে পড়ে, তখন অবাক্ হয়ে যেতে হয়। আজ এই বেদনা-ভরা পুণ্যদিনে সব চেয়ে বেশি মনে পড়্‌ছে স্নেহময়ী মায়ের স্নেহের কথা;—সে যে কি মিষ্ট, কি নিঃস্বার্থ, কি পবিত্র, তা বল্‌তে আমার কণ্ঠরোধ হয়ে যাচ্ছে। এত বয়স হল, কিন্তু তিনি আমাকে কোলের ছেলেটির মতই স্নেহ, যত্ন ও আদরে রেখেছিলেন; একটু রোগ, একটু যন্ত্রণায় তাঁর কি নিবিড় স্নেহ, তা কি আর ভুল্‌তে পারি? আমার ছেলে মেয়ের শক্ত অসুখ হলে ত কথাই নেই, অতি সামান্য অসুখেও আমরা বাড়ীশুদ্ধ সকলে ঘুমালেও তিনি মূর্ত্তিমতী দয়া ও স্নেহরূপে পাখা হাতে তাদের শিয়রে বসে, তাঁর সেই ভাঙ্গা দেহখানি লয়েই দীর্ঘরাত্রি অশ্রু-সজল-নেত্রে কাটিয়ে দিতেন।"

এই করুণহৃদয়া নারী কি ঘরের লোকের, কি অপরের রোগ, শোক ও দুঃখ বেদনা দেখিলেই স্নেহ ও সহানুভূতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিতেন। এ বিষয়ে হিন্দু, ব্রাহ্ম কি উঁচু নীচু কোন জাতি বলিয়া তাঁহার নিকট

কোন প্রভেদই থাকিত না। বোধ হয় এইরূপ উদারতা ছিল বলিয়াই তিনি সহজে জাতিভেদ ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন।

আমি নিজে ইঁহার যে স্নেহ ও দয়া প্রাপ্ত হইয়াছি, এ স্থানে তাহারও একটু উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমার হাঁপানী রোগের জন্য প্রত্যহ আমাকে একটি ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়। এই শ্রদ্ধার পাত্রী মৃত্যুর পূর্ব্বেও তাঁহার দেবর শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সহিত মিলিত হইয়া কলিকাতা হইতে আমার জন্য কয়েকটি ঔষধ আনাইয়াছিলেন; তাঁহার পরলোকযাত্রার পরে উহা আমি ব্যবহার করিয়াছি। তিনি আরো কুড়িটি টাকা আমার ঔষধপত্র কিনিবার জন্য রাখিয়া দিয়াছিলেন।

এই মাত্র যে বিপিন বাবুর নামোল্লেখ করিলাম, তিনি তাঁহার ভ্রাতৃবধূর গুণে একেবারে মুগ্ধ; কত সময় আমার কাছে বৌ-দিদির প্রশংসা করিয়া আনন্দ লাভ করেন। আমি শুনিয়াছি, আতরমণি দেবীর নিকট সম্পর্কীয় কোন আত্মীয় তাঁহার দুঃখিনী স্ত্রীর উপরে মোটেই ভাল ব্যবহার করিতেন না। সেই জন্য তিনি সেই আত্মীয়কে কাছে পাইলেই চোখের জলে ভাসিয়া বলিতেন, "তুমি আমাকে বল, তোমার স্ত্রীর উপরে দুর্ব্ব্যবহার করিবে না, নচেৎ কিছুতেই তোমাকে ছাড়িব না।"

আতরমণি দেবীর দানসম্বন্ধে আমি রামলাল বাবুর নিকট একটি বড় ভাল কথা শুনিয়াছি, তাহা এই স্থানেই লিপিবদ্ধ করিতেছি। আতরমণি দেবী যখন কলিকাতায় বাস করিতেন, তখন সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য তাঁহার হস্তে অনেক টাকা দেওয়া হইত। তিনি নিয়মিত খরচ করিয়া ঐ টাকা হইতে কিছু কিছু বাঁচাইয়া সঞ্চয় করিতেন। তাহাতে বিস্তর টাকা তাঁহার হাতে জমা হইত। তাহার পরে কোথাও দুর্ভিক্ষ কি অন্নকষ্টের সংবাদ পাইলে তিনি সমস্ত টাকাই

গোপনে দান করিতেন; ইহার একটি কথাও যাহাতে বাহিরের লোকের নিকট প্রকাশ না হয়, তিনি সেজন্য অতিশয় চেষ্টা করিতেন।

আতরমণি দেবীর দয়া ও সহানুভূতিবিষয়ে রামলাল বাবু লিখিয়াছেন—"আমাদের পল্লীতে এমন কোন দরিদ্রের কুটীর নাই, যেখানে গমন করিয়া তিনি তাঁহাদেরই একজন হইয়া সুখদুঃখের সংবাদ লন নাই। তিনি হিন্দু পরিবারে গিয়া প্রেমে ও মধুর ব্যবহারে লোকদিগকে আপনার করিয়া লইয়াছেন। আমাদের পাড়ায় একটি পূর্ণগর্ভা বালিকাবধূ আছেন। তাঁহার ঘরে স্বামী ছাড়া অন্য কেহই নাই। তিনি আতরমণিকে মা বলিতেন। আতরমণি মৃত্যু-শয্যায় শুইয়াও আমাকে বলিতেন, "দেখ, বউটি যেন প্রসব-বেদনায় কষ্ট পাইয়া মারা না যায়; তখন তুমি এখানকার ধাত্রীকে ডাকিয়া লইয়া আসিও।" আমি তৎক্ষণাৎ ধাত্রীকে সকল কথা বলিয়া আসিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলাম।"

৭

আমরা আতরমণি দেবীর এই ক্ষুদ্র জীবনচরিতটির নানা স্থানে নানা রকম বর্ণনাই ত করিয়াছি। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী পাঠকেরা সেই সকল কথা তলাইয়া দেখিলে, অল্পায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমি আমার রচনার সর্ব্বত্রই এই ভক্তিমতী নারীর জীবনের একটি বিশেষত্ব পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছি। সেই বিশেষত্ব তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্মতৃষ্ণা, ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য তাঁহার প্রয়াস এবং সেই জন্য তাঁহার সাধনা ও আধ্যাত্মিক ভাবের উচ্ছ্বাস। যেমন সূর্য্য-কিরণ-রঞ্জিত শিশিরকণা দূর্ব্বাদলকে সুন্দর করিয়া

তোলে, যেমন প্রস্ফুটিত শতদল মৃণালকে সুশোভিত করে, যেমন চন্দ্রালোক রজনীকে জ্যোতির্ম্ময়ী করিয়া থাকে; তেমনি যেন এক অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাব আতরমণি দেবীর জীবনকে সুন্দর ও সমুজ্জ্বল করিয়াছিল। আমরা তাঁহার সেই মনোমুগ্ধকর আধ্যাত্মিক জীবন দেখিয়াই আকৃষ্ট হইয়াছিলাম; এখন সেই সুন্দর ও সুপবিত্র জীবনের শেষ কথার প্রতি পাঠকদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট করিব। কিন্তু সেই চিত্তাকর্ষক কথাগুলি আমি আমার নীরস ভাষায় বর্ণনা না করিয়া, সাধিকা নারীর স্বামীর প্রাণস্পর্শী বর্ণনা হইতেই উদ্ধৃত করিব। তিনি প্রথমেই লিখিয়াছেন—

"আতরমণির সুনির্ম্মল হৃদয় পবিত্রতায় মাখানো ছিল। সুরুচির প্রতি তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। তরুণ বয়স হইতেই কখনও হাল্‌কা বিষয়ের প্রসঙ্গে, অথবা হাল্‌কা ভাবের গ্রন্থপাঠে তাঁহার রুচি ছিল না। শেষ জীবনে গৃহ-পরিবারে পবিত্রতা রক্ষার জন্য সর্ব্বদাই যেন ব্যাকুল থাকিতেন। পবিত্র ব্রহ্মাগ্নি তাঁহার প্রাণকে যেন খাঁটি সোণা করিয়াছিল। তিনি আমাদের সকলের এবং ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত নরনারীর প্রাণগুলি সেই রকম স্বর্ণখণ্ডের ন্যায়ই দেখিতে চাহিতেন।"

অতঃপর রামলাল বাবু স্বীয় পত্নীর ধর্ম্ম-সাধনের নিগূঢ় রহস্য-কথাটির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনাটি এই :—

"আতরমণি দেবীর ধর্ম্মসাধন যথার্থই গভীর ছিল। তিনি প্রকাশ্যে দুইটি কথা একত্র করিয়া প্রার্থনা করিতে পারিতেন না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে অতলস্পর্শ ব্রহ্মসাগরের সঙ্গে তাঁহার আত্মার যোগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি সংসারের চিত্ত-বিক্ষেপকারী নানা ঘটনায় ব্যস্ত থাকিতেন, রুগ্নভগ্ন শরীর লইয়াও কত পরিশ্রম করিতেন, অথচ উহার ভিতরে দিনের মধ্যে বার বার নিজের উপাসনার আসনে গিয়া

বসিতেন, হাত দুখানি যোড় করিয়া থাকিতেন, আর দর দর ধারায় ভক্তির অশ্রু প্রবাহিত হইয়া যাইত।

"প্রাণ ব্রহ্মপদে হস্ত কার্য্যে তাঁর
এই ভাবে দিন কাটুক আমার।"

এই প্রার্থনাই আতরমণির জীবনে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিল। তিনি প্রত্যহ রাত্রি তিনটার সময় শয্যায় বসিয়া এক ঘণ্টাকাল তন্ময় হইয়া ব্রহ্মধ্যানে ও ব্রহ্মরস পানে মগ্ন থাকিতেন। শরীর যতই ভাঙ্গিতে লাগিল, রাত্রের এই সাধন ততই গভীর হইতে লাগিল। এক এক দিন নিশীথকালে তাঁহার ক্রন্দনের শব্দে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত; তখন মনে হইত, কোন মাতৃহারা শিশুও বোধ হয় ইহার চেয়ে ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে পারে না। আমি এক এক দিন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় এই স্বর্গীয় দৃশ্য দর্শন করিতাম। তাঁহার নিষেধ ছিল বলিয়া ঐ সময়ে আমি কোনরূপ শব্দ কি সঙ্গীত করিতাম না। সাধনের সময়ে তিনি রোগের কোন যাতনাই অনুভব করিতেন না; কিন্তু মধ্যে মধ্যে সাধনের শেষে পৃষ্ঠে তীব্র যাতনা অনুভব করিতেন। তখন আমি তাঁহার মেরুদণ্ড ও পঞ্জর বার বার ঘষিয়া দিতাম; উহাতেই তিনি ঘুমাইয়া পড়িতেন। এই যে নিষ্ঠার সহিত সাধন, ইহা তিনি একদিনের জন্যও ত্যাগ করেন নাই। আমার ইচ্ছা হইত, যাঁহারা বলেন, নিরাকারের সাধনায় ভক্তি চরিতার্থ হয় না, তাঁহাদিগকে আমার কুটীরে আনিয়া দেখাই যে নিত্য নিশীথকালে ভক্তিমতী নারীর সঙ্গে ভগবানের কিরূপ মধুর লীলা চলিতে থাকে।

"আতরমণি দেবী শেষ জীবনে কিছুদিন নির্জ্জন স্থানে গিয়া গভীর ভাবে সাধন করিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তিনি আমাকে বলিতেন, "দেখ, ঈশ্বর আমাদের অনুকূল অবস্থা আনিয়া দিয়াছেন, সংসারের কোন চিন্তা নাই, নিজেদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েও নাই;

চল না, একবার নির্জ্জনে গিয়া কিছুদিন প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ডাকি এবং তাঁহাকে লইয়াই থাকি।" কিন্তু নানা কারণে আমি তাঁহার এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার সহায় হইতে পারিলাম না; তাঁহার সম্বন্ধে বহু ক্ষোভ ও অপরাধের মধ্যে ইহাই আমাকে তীব্র যাতনা দিতেছে। তাঁহার মুক্ত আত্মা আমার এই অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

"আতরমণি দেবীর এক দিকে যেমন ঘরের ছেলেমেয়েদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ এবং মায়া ছিল, অন্য দিকে একেবারে যেন মুক্ত আত্মা ছিলেন। আমাদের পাঁচ বৎসর বয়সের পৌত্রী অণুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "অণু, ঠাকুর মা তোমাদের মধ্যে কাহাকে বেশি ভাল-বাসেন?" সে একটু হাসিয়া বলিল, "ঠাকুর মা সব চেয়ে হরিকেই বেশি ভালবাসেন।" গৃহের পাঁচ বছরের শিশুও তাঁহার জীবনের গভীর কথা বুঝিতে পারিয়াছিল। একদিন রবীন্দ্রনাথের এই সঙ্গীতটি তাঁহাকে শুনাইতেছিলাম—

"ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা প্রভু,
তোমার পানে তোমার পানে তোমার পানে।"

গানটি শুনিতে শুনিতে ভক্তির উচ্ছ্বাসে তাঁহার চিত্ত এমন অধীর হইয়া উঠিল যে, মাটিতে সাষ্টাঙ্গে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।"

এই স্থানে আতরমণি দেবীর ভক্তি ও ভাবোচ্ছ্বাস সম্বন্ধে আমাদের আর একটি কথা স্মরণ হইতেছে। গিরিডির আঠার মাইল দূরেই পরেশনাথ পাহাড়। এই পাহাড়ের অভ্রভেদী শৃঙ্গে আরোহণ করিলে চোখের সাম্‌নে যথার্থই সৌন্দর্য্যের এক অপরূপ মায়াপুরী দর্শন করিতে পারা যায়। আতরমণি দেবী কয়েকবার স্বামীর সঙ্গে এই পরেশনাথ পাহাড়ে গমন করিয়াছেন। আমি রামলাল বাবুর কাছেই শুনিয়াছি, সেই ভক্তিমতী নারী, পর্ব্বতের উচ্চ শৃঙ্গে দাঁড়াইয়া

চতুর্দ্দিকের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে তন্মধ্যে যেন সত্য সত্যই অসীম-সুন্দর-পুরুষের অনুপম মাধুরী নিরীক্ষণ করিতেন। তাই তিনি কিছুক্ষণ পরেই ভক্তির উচ্ছ্বাসে পাগলিনীর মত হইয়া উঠিতেন। তিনি একবার পরেশনাথ পাহাড়ে গমন করিলে আর সহজে সেই অপূর্ব্ব স্থান ত্যাগ করিয়া গিরিডি আসিতে চাহিতেন না।

রামলাল বাবু সর্ব্বশেষে লিখিয়াছেন, "সকলেই বলিতেছেন, আতরমণি দেবী পতি এবং একমাত্র পুত্র, একমাত্র কন্যা, জামতা, পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী ও দেবরকে রাখিয়া, সংসারের সুখ স্বচ্ছন্দতা দেখিয়া, সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা লাভ করিয়া পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন; তাঁহার মতন আর ভাগ্যবতী নারী কয়জন আছেন? এ কথা সত্য বটে; কিন্তু তাঁহার ন্যায় সহধর্ম্মিণী, গৃহিণী ও দেবীকে হারাইয়া আপনাকে এবং মা-হারা সন্তানদিগকে ভাগ্যহীন মনে না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। দয়াময় ঈশ্বর চিরদিন এই দেবীর পুণ্যময় জীবন আমার সম্মুখে উজ্জ্বল করিয়া রাখুন। আজ সেই দেহমুক্ত আত্মাকে বার বার প্রণাম করি; তিনি আমাদের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করুন, প্রসন্নদৃষ্টিতে আমাদের উপরে শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন।"

যে পুণ্যশীলা রমণীর ধার্ম্মিক পতি এমনি করিয়া স্ত্রীর প্রতি অন্তরের ভক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহার নারীজীবন যে রত্নমণ্ডিত দেবালয়ের চূড়ার মতন গৌরবমণ্ডিত, তিনি যে যথার্থই সৌভাগ্যবতী সে কথা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে।

কিন্তু এইখানেই আমাদের এই শ্রদ্ধার পাত্রীর জীবনের কাহিনী সমাপ্ত করিতে হইবে। তাঁহার সম্বন্ধে আর আমাদের কিছুই বলিবার নাই। আমি অগ্রেই উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহার বহুমূত্র রোগের সঞ্চার হইয়াছিল; এখন সেই রোগের বৃদ্ধি হইল। তাহার সঙ্গে ভয়ানক পেটের অসুখ দেখা দিল। দুয়ে মিলিয়াই যেন নিষ্ঠুর মৃত্যুকে ডাকিয়া

আনিল। কত চিকিৎসা ও শুশ্রূষা; কিন্তু কিছুই হইল না। দেখিতে দেখিতে ১৯২১ সালের ২১শে জুলাই আসিয়া উপস্থিত হইল। সেদিন সকাল বেলায় আমি তাঁহাকে দেখিতে গেলাম; তিনি একবার একটু চোখ মেলিয়া আমার দিকে চাহিলেন। তাহার কয়েক ঘণ্টা পরেই সব শেষ হইয়া গেল; পুণ্যবতী নরীর আত্মা তাঁহার পরম প্রিয় দেবতা ঈশ্বরের নিকটেই প্রস্থান করিল।

মৃত্যুর পরে সেই সুন্দর ও পবিত্র দেহ উত্তম বস্ত্রে ও রাশি রাশি পুষ্পে সাজানো হইল। বিস্তর পুরুষ ও নারী শ্রদ্ধার সহিত সেই দেহের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন আতরমণি দেবীর প্রিয় ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হইল। উপাসনার পরে অনেকে তাঁহার সুসজ্জিত দেহ লইয়া শ্মশানে চলিলেন। যাঁহারা তাঁহার স্নেহ ও করুণা লাভ করিয়া কতই উপকৃত হইতেন, তাঁহারা ঐ সময়ে বিলাপ করিতে লাগিলেন। অবশেষে সেই সুন্দর দেহ চিতাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া গেল।

অন্নপূর্ণা দেবী

প্রথম পরিচ্ছেদ

জন্ম ও পরিণয়

বগুড়া উত্তর বঙ্গের একটি ছোট সহর। স্বর্গীয় শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঐ সহরে ডাক্তারি করিতেন। অন্নপূর্ণা দেবী তাঁহারই ধর্ম্মশীলা পত্নী। যেমন বনপুষ্পের সুগন্ধ বনের বাহিরেও ছড়াইয়া পড়ে, নর-নারী তাহার সুঘ্রাণে পুলকিত ও মুগ্ধ হয়; তেমনি অন্নপূর্ণা দেবীর জীবনকুসুমের সৌরভ গৃহের বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বিস্তর পুরুষ ও নারী সেই সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বগুড়া সহরের অনেক সুশিক্ষিত লোকের সঙ্গেই তাঁহার আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। অন্নপূর্ণার আধ্যাত্মিক শক্তির ও মহত্ত্বের পরিচয় পাইয়া সকল সম্প্রদায়ের উদারচিত্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন। এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বত্রই অন্নপূর্ণা দেবীর প্রশংসা শুনা যাইত। স্বর্গীয় আচার্য্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও কৃতী পুরুষ স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়ও শ্রদ্ধার সহিত এই নারীর নামোল্লেখ করিতেন। এখন অনেক পুরুষ ও নারীর হৃদয় হইতে ইঁহার স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। অনেক দিন হইল এই শ্রদ্ধেয়া মহিলার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর পরে তাঁহার শোকার্ত্ত স্বামী বন্ধুদিগের অনুরোধে স্বীয় পত্নীর জীবনচরিত ও অনেকগুলি রচনা এবং বন্ধুদিগের বিস্তর চিঠি একখানি গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থখানি আত্মীয়স্বজন ও পরিচিত লোকের বাহিরে অন্য কোথাও প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সেই জ ন্য আমি অন্নপূর্ণা দেবীর জামাতার নিকট হইতে উহার একখানি

পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছি এবং সেই বৃহৎ গ্রন্থের জীবনচরিত ও চিঠি-পত্রের চিত্তাকর্ষক অংশ অবলম্বন করিয়া এই রচনাটি লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

অন্নপূর্ণা দেবী ১২৬৩ সালের কার্ত্তিক মাসে ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের একটি পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামকুমার চৌধুরী। তিনি ব্রাহ্মণ। সমাজে তাঁহাদের চৌধুরী পরিবারের বিলক্ষণ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। অন্নপূর্ণা পিতৃগৃহে অতিশয় যত্ন ও আদরের মধ্যেই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। অল্প বয়সেই নানা বিষয়ে তাঁহার স্বাভাবিক শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি যখন ক্ষুদ্র বালিকা, তখনই নিষ্ঠার সহিত প্রাচীন কালের ব্রত নিয়ম পালন করিতে চেষ্টা করিতেন।

অন্নপূর্ণা দেবীর পিতার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘর; সেকালে সে বাড়ীতে কোন্ মেয়েইবা লেখাপড়া শিখিতে চাহিত? কাহার কল্পনায়ই বা সে কথা আসিত? কিন্তু কি আশ্চর্য্য! অন্নপূর্ণা ছেলেদের লেখাপড়া শিখিতে দেখিয়া, তিনিও লেখাপড়া শিখিবার জন্যই আব্দার আরম্ভ করিলেন; তাহার পরে সেই আব্দারই জেদ হইয়া দাঁড়াইল। বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা ত তাঁহার কাণ্ডকারখানা দেখিয়া অবাক্! তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—"তুমি যে মেয়ে, তোমার আবার লেখাপড়া শেখার জন্য জেদ কেন? তুমি ঘরকন্না কর, রান্নাবান্না শেখ। লেখাপড়া শিখিয়া কি হইবে? পুরুষের মতন ত আর চাকুরি করিতে যাইবে না?"

অন্নপূর্ণার অধিক বয়সে যখন তাঁহার রচনা ছাপা হইত, তখন তিনি তাঁহার "দৃঢ়তা" শীর্ষক প্রবন্ধের ভিতর লিখিয়াছিলেন—"আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করিবার প্রধান সম্বল সত্য ও দৃঢ়তা। দৃঢ়তাই মানবের উন্নতির মূল কারণ।" আমরা ইহার পরে দেখিতে পাইব, এই দৃঢ়তাই অন্নপূর্ণার হৃদয়কে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি সেই বলিষ্ঠ

হৃদয়ের শক্তিতেই জীবনের উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার কুসুমকোমল নারীপ্রকৃতির ভিতর আশ্চর্য্য দৃঢ়তা ছিল। তিনি যে কাজটি ভাল বলিয়া বুঝিতেন, করিবেন বলিয়া বলিতেন, সে কাজ হইতে কেহই তাঁহাকে ফিরাইতে পারিত না। অন্নপূর্ণাকে বাড়ীর মেয়েরাও লেখাপড়া শিখিতে দিবেন না, আর তিনি সেই লেখাপড়াই শিখিবেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার পিতৃব্য মহেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ বুদ্ধিমান ও উদার প্রকৃতিসম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রীর আগ্রহ দেখিয়া নিজেই তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন দেখা গেল, পড়াশুনাতে বালিকার বেশ স্বাভাবিক একটি শক্তি আছে। তিনি যাহা পড়েন, তৎক্ষণাৎ তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলেন, যাহা শুনেন, তাহা অল্প সময়ের মধ্যেই আয়ত্ত করিতে পারেন। তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে বিলক্ষণ সৌন্দর্য্যানুরাগ লক্ষ্য করা যাইত। সবুজ পত্রাবৃত তরুরাজি, হরিৎ কিশলয় সুশোভিত লতা ও উদ্যানের প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি তাঁহার চিত্ত হরণ করিত। সেজন্য বালিকা স্বহস্তে ক্ষুদ্র একটি উদ্যান তৈরী করিয়াছিলেন। তিনি তরুলতার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনের জন্য প্রত্যহ বাগানের কার্য্য করিতেন।

অন্নপূর্ণা বাড়ীর সমস্ত লোকের অতিশয় আদরের পাত্রী ছিলেন; সেই জন্য তাঁহাদের সকলেরই বাসনা ছিল, অন্নপূর্ণাকে একটি সুপাত্রের হস্তে অর্পণ করিবেন। এই সুপাত্রের প্রতীক্ষায় অন্নপূর্ণার আর নিতান্ত অল্প বয়সে বিবাহ হইল না, তাঁহার বয়স দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইল। আর কি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে মেয়েকে অবিবাহিত অবস্থায় রাখা যায়? তাই বাড়ীর সকলেই তাঁহার বিবাহের জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন অন্নপূর্ণার পিসতুত ভাই বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কলিকাতায় বাসা করিতেন ও ডাক্তারি পড়িতেন। তাঁহার অন্তরে সহরের নূতন আলো প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি স্ত্রীলোকদিগের সুশিক্ষার ও উন্নতির একান্ত

পক্ষপাতী ছিলেন। এই আত্মীয় যুবাপুরুষটি অন্নপূর্ণার মার্জ্জিত বুদ্ধি ও স্বাভাবিক শক্তি দেখিয়া, তাঁহার কল্যাণ চিন্তা করিতেন। ইঁহার সঙ্গে কলিকাতা প্রবাসী শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহারও বাড়ী বিক্রমপুরের একটি পল্লীগ্রামে। তিনি সম্পূর্ণ নব্যতন্ত্রের যুবক। তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র, উদার প্রকৃতি এবং ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ। তিনিও ডাক্তারি পড়িতেন। বিশ্বেশ্বর এই সচ্চরিত্র ও সদ্‌গুণসম্পন্ন যুবকের সঙ্গেই অন্নপূর্ণার বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। শ্রীমন্ত বাবু বন্ধুর নিকট পাত্রীর সুখ্যাতি ও উত্তম স্বভাবচরিত্রের কথা শুনিয়া বিবাহে স্বীকৃত হইলেন। বোধ হয় ইহার অল্পদিন পরেই তাঁহার সঙ্গে অন্নপূর্ণার শুভ-পরিণয় সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহিতা বালিকা বধূরূপে স্বামীর গৃহে গমন করিলেন। সে গৃহে তাঁহার যত্ন আদরের আর কিছুমাত্র অপ্রতুল রহিল না। পরিবারের সমস্ত লোক এই সুলক্ষণা বধূকে নিরীক্ষণ করিয়া অত্যন্ত খুসী হইলেন। বধূর সেবায় ও গৃহকার্য্যনৈপুণ্যে এবং সুমিষ্ট ব্যবহারে আত্মীয় স্বজনের চিত্ত আনন্দে আপ্লুত হইয়া গেল। তাঁহারা দেখিলেন, এই পরের মেয়েটি অল্পদিনের মধ্যেই ঘরের কন্যার মত সকলের সঙ্গেই একটি প্রাণের যোগ এবং মধুর সম্পর্ক স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস জন্মিল, এই বুদ্ধিমতী ও সদ্‌গুণসম্পন্না বধূর দ্বারা গৃহের সুখশান্তি বর্দ্ধিত হইবে।

বিবাহের পরে শ্রীমন্ত বাবু মেডিকেল স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহাকে গবর্ণমেণ্টের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করিতে হইল। চাকুরির জন্য তিনি সুদূর মফঃস্বলে গমন করিলেন; তাই পত্নীকে সঙ্গে রাখিবার আর সুবিধা হইল না। অবশেষে ঢাকায় তাঁহার কর্ম্মস্থল নির্দ্দিষ্ট হইল। তিনি সুযোগ বুঝিয়া অন্নপূর্ণাকে আপনার কাছে লইয়া আসিলেন। তখনো শ্রীমন্ত বাবু প্রকৃত ব্রাহ্ম নহেন; তাঁহার

মনটা ঐ ধর্ম্মের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার বন্ধুদিগের মধ্যে অনেকেই সচ্চরিত্র এবং ব্রাহ্ম। অন্নপূর্ণা দেবীকে স্বামীর অনুরোধে ঐ সমস্ত ধার্ম্মিক ব্রাহ্মের সহিত আলাপ করিতে হইল। তিনি এতদিন স্বামীর কাছে ব্রাহ্মসমাজের বিস্তর গল্প শুনিতে পাইতেন। সে সমস্ত তাঁহার ভালই লাগিত। কিন্তু কিরূপে নিরাকার ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিতে হয়, সে বিষয়ে তিনি পরিষ্কার জ্ঞানলাভ করিতে পারেন নাই। এইবার তাঁহার স্বামীর একটি অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে উপাসনাবিষয়ে উপদেশ লাভ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইল। তিনি আপনার মার্জ্জিত বুদ্ধি ও স্বাভাবিক ধর্ম্মভাবের সাহায্যেই উপাসনার মোটামুটি ভাবটি উপলব্ধি করিতে পারিলেন। তখন অন্নপূর্ণার বয়স অল্প বটে; কিন্তু সত্যানুরাগ অতিশয় প্রবল, অন্তরের দৃঢ়তাও অত্যন্ত অধিক। তাই যে মুহূর্ত্তে দেবদেবীর অর্চ্চনার পরিবর্ত্তে একমাত্র নিরাকার অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনা করাই তাঁহার কর্ত্তব্য বলিয়া বিশ্বাস জন্মিল, তিনি সেই মুহূর্ত্তেই উহা অবলম্বন করিলেন। এতদিনের প্রাচীন সংস্কার এই গ্রাম্যবালিকার মনের উপরে একটুকু প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না; গুরুজনের ভয়েও তিনি এই সংকল্প হইতে বিচলিত হইলেন না।

শ্রীমন্ত বাবু কিছুদিন সরকারি কর্ম্ম করিলেন, সেজন্য নানা জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইলেন; তাহার পরেই গবর্ণমেণ্টের কার্য্য ত্যাগ করিবার বাসনা তাঁহার অন্তরে প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি কোনও সহরে স্বাধীনভাবে ডাক্তারি করিবেন, এইরূপ সংকল্প করিলেন। কিন্তু হঠাৎ সরকারি চাকুরিটি ত্যাগ করিলে অসুবিধাও যথেষ্ট; হয় ত কিছুদিন তাঁহাকে দারিদ্র্যের সঙ্গেই সংগ্রাম করিতে হইবে। তা, মেয়েরা আর যাহাই করুন না কেন, ইচ্ছা করিয়া দারিদ্র্যকে বরণ করিতে চাহেন না। কিন্তু অন্নপূর্ণার কথা স্বতন্ত্র। তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে

স্বাধীনতার ভাব অত্যন্ত প্রবল। তিনি স্বামীকে কহিলেন—"অপরের অধীনতা ত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবে, তাহার চেয়ে আর ভাল কথা কি হইতে পারে? এজন্য আমাকে যদি দাসীর কাজ করিয়া দিন চালাইতে হয়, তাহাতেও আমি অসন্তুষ্ট হইব না।"

শ্রীমন্ত বাবু পত্নীর উৎসাহবাক্যে সাহস পাইয়া চাকুরিটি ত্যাগ করিলেন। তিনি একবার সরকারি কর্ম্মোপলক্ষে বগুড়ায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন; এখন তাঁহাকে সেই বগুড়া সহরে গিয়াই ডাক্তারি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইল। এই সময়ে অন্নপূর্ণা পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিয়া স্বামীর কাছে আসিলেন। তাঁহার ঘরকন্না আরম্ভ হইল। শ্রীমন্ত বাবু অন্নপূর্ণার স্বাভাবিক শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন বটে; কিন্তু এতদিন তাঁহার উন্নতির জন্য কিছুই করিতে সমর্থ হন নাই। এইবার তিনি উপদেশ ও উৎসাহের দ্বারা অন্নপূর্ণার স্বাভাবিক উন্নতিস্পৃহা উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিলেন। এ বিষয়ে এই পতিপ্রাণা নারীর বড়ই সৌভাগ্য ছিল। তাঁহার স্বামী শ্রীমন্ত বাবু অত্যন্ত উদার প্রকৃতির ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। পত্নীর বিষয়ে তাঁহার মনের কোন স্থানেই কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা অথবা স্বার্থপরতা ছিল না। তাই তিনি অন্নপূর্ণার মনোবৃত্তি সকলের বিকাশ ও আত্মার উন্নতির জন্য, সকল বিষয়ে তাঁহাকে স্বাধীনতা দান করিতে একটুকু কুণ্ঠিত হইলেন না। অন্নপূর্ণা পুলকিতচিত্তে আপনার শক্তির স্ফুরণ, মনের বিকাশ ও আত্মার উন্নতির জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষার উন্নতি ও সাহিত্যচর্চ্চা

একটি বিদেশিনী ইংরাজ মহিলার যত্নে ও চেষ্টায়, বগুড়া সহরে তরুণী নারীদিগের জন্য স্কুল স্থাপিত হইল। ব্রাহ্মসমাজের সুপরিচিত বরদানাথ হালদার, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি কয়েকজন সংস্কারপ্রিয় উৎসাহী লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী হইলেন। অন্নপূর্ণা তখন একটি সন্তানের জননী। কিন্তু তবুও তিনি সেই স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া পড়িতে লাগিলেন। বৎসরান্তে যে পরীক্ষা হইল, তাহাতে তিনিই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া পারিতোষিক লাভ করিলেন।

তৎপরে ১২৮১ সালে সাহিত্যানুরাগী শ্রীমন্ত বাবুর উদ্যোগে তাঁহারই বাটীতে "জাতীয়-সাহিত্য-সমিতি" ও তৎসঙ্গে একটি পুস্তকালয় স্থাপিত হইল। এই পুস্তকালয়ে প্রচুর গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, বান্ধব, জ্ঞানাঙ্কুর, সোমপ্রকাশ, অমৃতবাজার, সাধারণী, তত্ত্ববোধিনী প্রভৃতি তৎকালের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পত্রিকাগুলি আসিতে লাগিল। বর্ষার জল পাইয়া তরুলতার যে রকম অবস্থা হয়, ঐ সকল বই ও পত্রিকাগুলি প্রাপ্ত হইয়া অন্নপূর্ণার ঠিক্ সেইরূপ অবস্থাই হইল। তিনি গৃহকার্য্য, রন্ধন ও সন্তানপালন—এই সবই করিতেন, সে বিষয়ে তাঁহার কোনই ত্রুটি হইত না; অথচ তিনি মনের পুলকে পুস্তক ও পত্রিকা সমস্তই পড়িতেন। এজন্য তাঁহার পরিশ্রম অতিশয় বৃদ্ধি হইল; কিন্তু তিনি বাংলাভাষাটি উত্তমরূপে আয়ত্ত করিলেন, তাঁহার চিন্তাশক্তির বিকাশ হইল, তিনি সুমিষ্ট ভাষায় রচনা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অবলাবান্ধব ও তত্ত্বকৌমুদী পত্রে তাঁহার রচনা

মুদ্রিত হইতে লাগিল। শুধু তাহাই নহে; বুদ্ধিমতী নারীর বিচার করিবার ক্ষমতা ও সাহিত্যের রস গ্রহণের একটি স্বাভাবিক শক্তি ছিল। এজন্য তিনি গ্রন্থ ও মাসিকপত্রের প্রবন্ধগুলির অতি উত্তম সমালোচনা করিতে পারিতেন।

১২৯০ সালে বগুড়া সহরে অধ্যাত্মিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্নপূর্ণা দেবী এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী হন। তিনি এইখানেই হিন্দুশাস্ত্রের অনেকগুলি চমৎকার গ্রন্থ, বাইবেল, কোরাণ, রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী এবং নানা দেশের সাধু ও সাধ্বীদিগের জীবনচরিত পাঠ করেন। তাঁহার আশ্চর্য্য স্মরণশক্তি ছিল। প্রথম বয়সে মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচিত বীরাঙ্গনা কাব্যখানি তাঁহার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। তাই তিনি সেই গ্রন্থের আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। এখন সেই স্মৃতিশক্তির সাহায্যেই তিনি তাঁহার পঠিত গ্রন্থগুলির উৎকৃষ্ট অংশ মনের মধ্যে আয়ত্ত করিয়া লইলেন। উহার সুগভীর তত্ত্বের মধ্যে তাঁহার চিত্ত প্রবেশ করিল। এই সময় হইতে তাঁহার বক্তৃতাশক্তির বিকাশ হইল। তিনি মধুর স্বরে সুমিষ্ট বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। তখন নারীকণ্ঠের বক্তৃতা শুনিবার জন্য বিদ্যালয় গৃহে বিস্তর লোকের সমাগম হইত এবং অনেকেই তৃপ্তিলাভ করিতেন।

অন্নপূর্ণা দেবী চিকিৎসাশাস্ত্রেও ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। শরীরতত্ত্বসম্বন্ধে নানা বিষয় অবগত হইবেন এবং স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পারিবেন, সেই জন্য তিনি তাঁহার প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণের সময়ে চিকিৎসাসম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হন। এ বিষয়ে তিনি স্বামীর নিকটই যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিয়াছেন। ধাত্রীবিদ্যায় তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার জন্মিয়াছিল। শ্রীমন্ত বাবু লিখিয়াছেন—"কাহারো কোন রোগ উপস্থিত হইলে, কিরূপ সাবধান হইতে হয়, কিরূপে সুচিকিৎসা করিতে হয়, তাহা তিনি সুন্দররূপে জানিতেন

এজন্য তাঁহার ডাক্তারবন্ধুগণ তাঁহার বাড়ীতে কোন রোগী দেখিতে আসিলে, তাঁহার সহিত রোগীর অবস্থা ও ঔষধের ব্যবস্থাসম্বন্ধে আলাপ করিয়া সুখানুভব করিতেন।”

সুকুমার শিল্পে অন্নপূর্ণা দেবীর হাতখানি বেশ ভাল রকমেই খেলিত। তিনি অল্প বয়সেই চিত্রশিল্পে আপনার শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। তাহার পরে বগুড়াতেই তাঁহার শিল্পশিক্ষার সূচনা হয়। তখন তিনি আপনার উদ্ভাবনীশক্তির সাহায্যে অতি পরিপাটি সুচিক্কণ শিল্পদ্রব্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিদেশিনী শিক্ষয়িত্রী-গণ উহা দর্শন করিয়া বড়ই খুসী হইয়াছিলেন। তাঁহারা অন্নপূর্ণা দেবীকে এজন্য পুরস্কার বিতরণ করিয়া উৎসাহ দান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

সাহিত্য অন্নপূর্ণা দেবীর অত্যন্ত প্রিয় সামগ্রী ছিল। তিনি স্বয়ং প্রবন্ধ লিখিতেন, ছোট ছোট কবিতা রচনা করিতেন। কবিতা-গুলির প্রশংসা করা যায় না, কিন্তু প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে তাঁহার ধর্ম্মভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। অন্নপূর্ণা দেবী সাহিত্য ভালবাসিতেন, তাই কোন সুলেখক বগুড়াতে আগমন করিলে তিনি তাঁহাকে গৃহে আহ্বান করিয়া, তাঁহার সহিত নানা বিষয়ে আলোচনা করিতেন। এই মনস্বিনী নারীর জ্ঞান ও মহৎ বিষয়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল। সেজন্য তিনি বগুড়া প্রবাসী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ, উকিল, স্কুল-মাষ্টার, ডাক্তার প্রভৃতি নানা শ্রেণীর সুশিক্ষিত লোকদিগের সহিত প্রকাশ্য ভাবে আলাপ করিতেন। তাঁহারাও অন্নপূর্ণা দেবীর সঙ্গে সাহিত্য, ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয়ে আলোচনা করিয়া অত্যন্ত সুখী হইতেন। একবার কলিকাতা হইতে সর্ব্বজনমান্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুলেখক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বগুড়ায় গমন করিয়াছিলেন। অন্নপূর্ণা দেবী এই দুই স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তির

সঙ্গেই আগ্রহের সহিত নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন। মহিলাগণ সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, স্বাধীনতা লাভ করিলে ও তাঁহাদের অন্তরে ধর্ম্মভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিলে, সুরুচিসম্পন্ন পুরুষেরা ঐ সকল নারীর সহিত সাহিত্য ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া যে অন্তরে নির্ম্মল আনন্দলাভ করিতে পারেন, সে বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্বামীর সেবা ও সংসার-ধর্ম্ম

অন্নপূর্ণা দেবীর ধর্ম্মপরায়ণ স্বামী পত্নীর শিক্ষা, স্বাধীনতা ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য যেরূপ চেষ্টা করিয়াছেন, বোধ হয় সেই সময়ে অতি অল্প পুরুষই স্ত্রীর জীবনগঠন ও সুখসৌভাগ্যের জন্য ঐ রকম চেষ্টা করিতেন। সাধ্বী অন্নপূর্ণার এই স্বামীর প্রতি যে গভীর প্রেম ছিল, তাহা স্মরণ করিলেও চিত্ত আনন্দে আপ্লুত হয়। এই শুদ্ধ-চরিত্রা নারীর প্রেমের আদর্শই ছিল অতি পবিত্র ও অতি উন্নত। তিনি মনে করিতেন, নারীর স্বামীই একমাত্র প্রেমের পাত্র; সুতরাং নারীর কাছে স্বামীই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। প্রেমময়ী অন্নপূর্ণা এই মহৎ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই জীবনের পথে চলিতেন এবং স্বামীর প্রতি যত প্রকার কর্ত্তব্য আছে, তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন। নারীর পক্ষে যে সকল কার্য্য করা এক রকম দুঃসাধ্য, তিনি স্বামীর আদেশে সেই সকল কার্য্য করিতেও কুণ্ঠিতা হন নাই। উহা লক্ষ্য করিয়াই বগুড়ার এসিষ্টাণ্ট সার্জন ও সুলেখক ডাক্তার প্যারীশঙ্কর গুপ্ত মহাশয়

লিখিয়াছেন—"স্বামীর প্রতি তাঁহার যতদূরভক্তি ও আস্থা দেখিয়াছি, তদ্রূপ আর কোথাও দেখিয়াছি, এমন স্মরণ হয় না।"

এই উক্তি মোটেই অতিরঞ্জিত নহে। আমরা জানি, এক সময়ে শ্রীমন্ত বাবুর কঠিন পীড়া হওয়ায়, অন্নপূর্ণা দেবী যে রকম ভাবে স্বামীর সেবা করিয়াছিলেন, তাহা দর্শন করিয়া লোকের অন্তরে বিস্ময়ের উদ্রেক হইয়াছিল। এই সময়ের একটি ঘটনা লক্ষ্য করিয়া পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় একখানি চিঠিতে লিখিয়াছেন—

"একটি বিষয় দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। তাঁহার পতির যখন গুরুতর পীড়া, চতুর্দ্দিকে অকূল বিপদ সাগর, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর কি একটার সময় দেখি, সন্তানগণকে ঘুম পাড়াইয়া সেই রাত্রে অন্নপূর্ণা পাঠ করিতেছেন। এত রাত্রে পড়িতেছেন বলিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হওয়াতে বলিলেন, "পতির পীড়ার শুশ্রূষা কিরূপে করিতে হইবে, চিকিৎসাসম্বন্ধীয় গ্রন্থ পড়িয়া তাহা জানিতে চেষ্টা করিতেছি।" সমস্ত দিনের পরিশ্রম ও দুশ্চিন্তার পরে শরীর ও মন দুই যখন ভাঙ্গিয়া পড়ে, এরূপ সময়ে এই অধ্যবসায় দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিলাম।"

অন্নপূর্ণা দেবী জ্ঞানালোচনা, ধর্ম্মসাধন, সন্তানপালন ও পরসেবার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মবিস্মৃত হইয়া স্বামীর পায়ে হৃদয় ঢালিয়া দিয়া তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইতেন। সেই জন্যই শ্রীমন্ত বাবু সুস্থ অবস্থায় সহধর্ম্মিণীকে দেবীর মত মনে করিয়া, তাঁহাকে অন্তরের শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি এইরূপ ধর্ম্মশীলা ও শক্তিসম্পন্না পত্নীর সাহায্যে কিরূপ ভাবে উচ্চতর জীবনের পথে অগ্রসর হইতেন, এই স্থানে সেই বিষয়েরও কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব। একবার শ্রীমন্ত বাবু পত্নীর নিকট আপনার একটি দুর্ব্বলতার কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কোন বুদ্ধিহীনা অভিমানিনী স্ত্রী হইলে হয় ত স্বামীর সেই দুর্ব্বলতার কথা শুনিয়া মুখ ভার ও মন খারাপ করিয়া বসিতেন।

কিন্তু অন্নপূর্ণা দেবী গম্ভীরভাবে স্বামীকে কহিলেন, "তোমাকে অনেক ধর্ম্মহীন লঘুচিত্ত মানুষের সঙ্গে মিশিতে হয়; তাহারা যে সকল নিকৃষ্ট বিষয়ের আলোচনার দ্বারা ধর্ম্মকে হীন করিয়া পাপের সমর্থন করে, তাহাও তুমি শুনিয়া থাক। সেই জন্যই তোমার মনের ভিতর মলিন চিন্তা প্রবেশ করিয়াছিল। আমি অনুরোধ করি, ঐ সকল হীনচরিত্র মানুষের সঙ্গে আর মিশিও না। দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে ব্যাকুলচিত্তে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিও; তাহা হইলেই তুমি এই শত্রুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিবে।"

শ্রীমন্ত বাবু এই বিষয়ে স্বয়ং লিখিয়াছেন—"অন্নপূর্ণার বাক্য আমাকে মোহনিদ্রা হইতে জাগ্রত করিল। * * এই সময় হইতে অন্নপূর্ণার জীবন আমার জীবনের উপরে গুরুভাবে কর্ত্তৃত্ব করিতে আরম্ভ করিল। কোন সময়ে কোন একটু অন্যায় কার্য্য করিলে তজ্জন্য তাঁহার মিষ্ট ভৎর্সনার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিতাম না।"

ইহাকেই ত প্রকৃত ধর্ম্মশীলা পত্নীর কার্য্য বলা যাইতে পারে; নচেৎ যে স্ত্রীলোক স্বামীর কাছে গহনাখানি, ভাল জিনিসটি ও ভালবাসাটুকু পাইয়াই খুসী হন, কিন্তু স্বামীর সংগ্রামের সময়ে সাহায্য করিতে পারেন না, বিপদের মুহূর্ত্তে বল দিতে পারেন না; দুর্ব্বলতার সময়ে শুধুই মান অভিমান ও অশ্রুসিক্ত নয়নের দ্বারা স্বামীর জীবনকে তিক্ত করিয়া তোলেন, সেরূপ পত্নীকে জীবনের সঙ্গিনী বলা যায় কি না সন্দেহ।

শ্রীমন্ত বাবু স্বরচিত অন্নপূর্ণা চরিতের একটি স্থানে পত্নীর সদ্গুণের উল্লেখ করিয়া পরিশেষে লিখিয়াছেন, "অন্নপূর্ণার মধুর প্রকৃতির জন্য আমার গৃহ আনন্দের নিকেতন ছিল। বহু দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া গৃহে আসিয়াও তাঁহার অত্যল্প কালের ব্যবহারে সকল জ্বালা ভুলিয়া গিয়াছি।"

অন্নপূর্ণা দেবী গৃহকর্ত্রী ও জননীরূপে যে সকল কর্ত্তব্য পালন করিতেন, এখন সেই বিষয়ে গুটিকয়েক কথার উল্লেখ করিব। তাঁহার তিন পুত্র ও তিন কন্যা জীবিত আছেন। তাহা ছাড়া আরো তাঁহার সন্তান ছিল। অতিথি ও ধর্ম্মবন্ধুদিগের জন্য তাঁহার গৃহদ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকিত। অনেক ধর্ম্মপিপাসু ও শান্তিহারা নরনারী প্রাণের ব্যাকুলতা ও হৃদয়ের জ্বালা লইয়া এই স্নেহময়ী নারীর গৃহেই উপস্থিত হইতেন। কাজেই তাঁহাকে গৃহকার্য্যের জন্য অতিশয় পরিশ্রম করিতে হইত। তিনি যথার্থই সুগৃহিণী ছিলেন। রান্নাবান্না বিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ হাতযশ ছিল। অন্নপূর্ণা দেবী অতি পরিপাটিরূপে নানারকম তরকারি ও মিষ্টান্ন স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া স্বামীকে, সন্তানদিগকে এবং অতিথি ও বন্ধুগণকে আহার করাইতেন। ইহাতে তাঁহার অন্তরে বিমল আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। যাঁহারা তাঁহার তৈরী উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী দ্বারা রসনা পরিতৃপ্ত করিতেন, তাঁহারা বড়ই খুসী হইতেন। এ বিষয়ে একটি ঘটনা বর্ণনা করিবার লোভ কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।

একবার দেশমাতার সুসন্তান আনন্দমোহন বসু মহাশয় বগুড়া সহরে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে অন্নপূর্ণা দেবীর ধর্ম্ম, সাহিত্য ও সমাজনীতিবিষয়ে বিস্তর আলোচনা হইয়াছিল। বসু মহাশয় প্রীত হইয়াছিলেন। কিন্তু অন্নপূর্ণা দেবী তাঁহার সহিত শুধু আলাপ করিয়াই খুসী হইতে পারেন নাই; তিনি দুই দিন তাঁহাকে আহারের জন্য গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। একদিন বসু মহাশয় নিরূপিত সময়ে আহারের জন্য অন্নপূর্ণা দেবীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। তাহার পরে তিনি যখন খাবার ঘরে গিয়া আসনখানির উপরে বসিলেন, তখনই তাঁহার চক্ষু স্থির! তাঁহার সম্মুখে লুচি, পোলাও, মাছ, ডাল, তরকারি, ভাজা, টক ও মিষ্টান্ন ইত্যাদি এক শত রকমের সামগ্রী সারি সারি

সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। তবে উহার সবগুলিই যে অন্নপূর্ণা দেবী স্বহস্তে রান্না করিয়াছিলেন, তাহা নয়; পাড়ার মেয়েরাও অনেকগুলি খাদ্য দ্রব্য তৈরী করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কারণ ঐ সময়ে কোন কারণে অন্নপূর্ণার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল।

আমরা এখন এই গৃহকার্য্য সম্বন্ধে ইঁহার প্রতিবেশী শ্রীযুক্ত সারদানাথ খাঁ বি-এ, মহাশয়ের একখানি চিঠির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব। তিনি লিখিয়াছেন—"অন্নপূর্ণা দেবী পার্থিব অলঙ্কারাদি বেশভূষাতে নিতান্ত স্পৃহাহীন হইলেও সাংসারিক কার্য্য অতিশয় মনোযোগ ও দক্ষতার সহিত নির্ব্বাহ করিতেন। প্রত্যেক কার্য্যের অন্তরালে তাঁহার প্রতিভা ও সৌন্দর্য্য-শক্তির স্পষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইত। বিদ্যা ও বুদ্ধি গৃহের পারিপাট্যসাধনে ও রন্ধনকার্য্যের উৎকর্ষতা সম্পাদনে তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল।"

সন্তানদিগের প্রতি মাতার যে কি কর্ত্তব্য, অন্নপূর্ণা দেবী তাহা খুব ভালই বুঝিতেন এবং সে কর্ত্তব্য অতি উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার নিকট পুত্র ও কন্যার কোন প্রকার পার্থক্যই ছিল না। ছেলেদের ও মেয়েদের স্বাস্থ্য যাহাতে খুব ভাল থাকে, শিক্ষার যাহাতে উন্নতি হয়, তাহাদের সুকোমল মনোবৃত্তিগুলি যাহাতে সুন্দররূপে বিকশিত হইয়া উঠে, সে বিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। ছেলে মেয়েরা তাঁহাকে খুব বিরক্ত করিলেও, তিনি ধৈর্য্য হারাইতেন না, উত্তেজিত হইয়া তাঁহাদিগকে অন্যায়রূপে শাসন করিতেন না; সর্ব্বদাই প্রসন্নমুখে ও মধুরভাবে শিক্ষাদান করিতেন। পুত্রকন্যাদিগের সুকুমার হৃদয়ে, ধর্ম্মের সরল ও মধুর ভাব পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে, তাঁহার বিশেষ চেষ্টা দেখা যাইত। সেজন্য তিনি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে লইয়া বাড়ীর একটি মনোরম উদ্যানে প্রবেশ করিতেন; সেখানে বালক-বালিকাদিগের উপযোগী সঙ্গীত, প্রার্থনা, কবিতা পাঠ ও কথাবার্ত্তা

হইত। এই শিক্ষিতা রমণী স্বয়ং সন্তানদিগের জন্য কতকগুলি সরল কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

অন্নপূর্ণা দেবীর ছেলেমেয়েদের মধ্যে সুশীলা দেবীই সকলের চেয়ে বড়। আমরা তাঁহাকে খুব ভাল রকমেই জানি। তাঁহার সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা আছে। তিনি জননীর শিক্ষা মস্তকে লইয়া ও তাঁহার উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া, ধর্ম্মপথেই অগ্রসর হইতেছেন। সুশীলা দেবী মাতার অন্তিম উপদেশ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"মাকে বলিলাম—মা, আপনি ত চলিয়া যাইবেন, আমাদের কি কিছুই বলিয়া যাইবেন না?" ধীরে ধীরে তিনি এই শেষ উপদেশ ও আদেশ দিলেন যে, "সর্ব্বদা প্রফুল্ল অন্তরে বিশ্বাসী, নির্ভরশীল ও সহিষ্ণুর ন্যায় প্রাণারামের আদেশ পালন করিয়া যাও। আর কিছুই দেখিও না। তাঁহাকে জীবন অর্পণ করিয়া, তাঁহার বলে জীবনপথ অতিক্রম কর। তাঁহার হও।" * * বলিব কি, এই আদেশই * * আমাদের প্রাণে কার্য্য করিতেছে, বলবিধান করিতেছে এবং আমাকে ঈশ্বর-বিচ্যুতি, পাপ ও মলিনতা হইতে রক্ষা করিতে নিযুক্ত রহিয়াছে। মা গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার জীবন এবং অন্তিম-আদেশ সর্ব্বদাই প্রাণে রহিয়াছে।"

যে সন্তানগণ মাতৃ-আদেশ দৈববাণীর মত আজীবন হৃদয়ে রক্ষা করিতে পারেন এবং তদনুসারে জীবনগঠন করিতে ও পৃথিবীর পাপ-প্রলোভন হইতে মুক্ত থাকিতে সমর্থ হন; সেই সন্তানদিগের জননীর শক্তি যে কি অসাধারণ এবং পুত্রকন্যাদিগের উপরে তাঁহার প্রভাব যে কত অধিক, আমরা তাহা অনায়াসেই অনুভব করিতে পারি। আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি, অন্নপূর্ণা দেবী অধ্যয়ন, ধর্ম্মসাধন ও পরসেবা যতই করুন না কেন, তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগের সঙ্গে সাহিত্যচর্চ্চা ও ধর্ম্মালোচনাতে যতই সময় যাউক না কেন, তিনি গৃহকর্ত্রীর দায়িত্ব ও

জননীর কর্ত্তব্য কখনই বিস্মৃত হন নাই। নারীর পূর্ণ আদর্শটিই তাঁহার অন্তরে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল; তিনি নিরন্তর সেই আদর্শ অনুসারেই চলিতে চেষ্টা করিতেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সেবাব্রত

স্বয়ং বিধাতাই মাতৃস্বরূপিণী নারীকে হৃদয়মাহাত্ম্যে দেবী করিয়া রাখিয়াছেন। তাই কল্যাণময়ী নারী আপনার সুখস্বার্থ বিস্মৃত হইয়া নিরন্তর বিশ্বের মঙ্গলসাধন করিতেছেন। নারীর গূঢ় মর্ম্মস্থানেই যেন প্রীতি ও করুণার অমৃতনির্ঝরি লুক্কায়িত রহিয়াছে। তাই নারী যখনই সেবায় প্রবৃত্ত হন, তখনই তাঁহার হৃদয় হইতে স্নেহের নির্ঝরধারা নামিয়া আসিয়া আমাদের চিত্তকে সরস ও মধুময় করিয়া তোলে। স্নেহময়ী অন্নপূর্ণার হৃদয়ের অমৃতধারায় অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোকের উত্তপ্ত প্রাণ জুড়াইয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার সেবার দ্বারা পাড়া-প্রতিবেশী এবং সহরের অনেক লোকেরই যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। তাই এখন আমরা খুব সংক্ষেপে তাঁহার সেবার কাহিনী লিপিবদ্ধ করিব।

এখন ত প্রায় সকল সহরেই মেয়ে ডাক্তার ও পাশ-করা ধাত্রী দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখন বগুড়ার মতন একটি ছোট সহরে কোথায়ই বা মেয়ে ডাক্তার, কোথায়ই বা পাশ-করা ধাত্রী? সন্তান প্রসবের সময়ে কত স্ত্রীলোক যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেন, তাহা কে নিশ্চয় করিয়া বলিবে? তবে এই কথা আমরা বলিতে পারি, যে, যখন অন্নপূর্ণা দেবী

সেবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, তখন সহরের অধিকাংশ মহিলাই ধাত্রীর অভাব অনুভব করিতে পারেন নাই। কোন প্রসূতির সন্তান প্রসব হইবার সময়ে তিনি নিদারুণ ক্লেশ সহ্য করিতেছেন, অথবা কেহ রোগশয্যায় পড়িয়া শুশ্রূষার অভাবে অত্যন্ত যন্ত্রণা সহিতেছেন,—এই সংবাদ অন্নপূর্ণা দেবীর কর্ণে প্রবেশ করিলেই তিনি ঐসকল মহিলাদিগের গৃহে গমন করিতেন। তাঁহার সেবা শুশ্রূষাতে সকলেরই রোগযন্ত্রণার উপশম হইত।

একবার বগুড়া প্রবাসী বৈকুণ্ঠনাথ খাঁ মহাশয়ের পত্নীর একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। তাহার পরে হঠাৎ সূতিকাগৃহখানি আগুনে পুড়িয়া গেল। খাঁ মহাশয়ের আত্মীয়া মহিলাগণ প্রসূতিকে অশুচি মনে করিয়া, তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও স্বীকৃত হইলেন না। অল্প সময়ের মধ্যেই এই কথাটা অন্নপূর্ণা দেবীর কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি তাড়াতাড়ি খাঁ মহাশয়ের গৃহে গমন করিলেন। প্রসূতির জন্য যাহা কিছু করা আবশ্যক, তাহা সকলই করা হইল। অন্নপূর্ণা দেবী ক্রমাগত পাঁচ দিন প্রসূতি ও নব কুমারীর সেবা করিয়া তাঁহাদিগকে সুস্থ ও সবল করিয়া তুলিলেন। এই প্রসূতির তৃতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করিবার পরে, তিনি গুরুতর পীড়ায় কাতর হইয়া পড়িলেন। তখনও অন্নপূর্ণা দেবীই শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিলেন। এই সময় হইতেই বৈকুণ্ঠ বাবু অন্নপূর্ণা দেবীকে অন্তরের সহিত ভক্তি করিতেন এবং "দেবী" সম্বোধন করিয়া চিঠি লিখিতেন।

বগুড়ার কৃষ্ণনাথ সান্যাল মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্রের নাম সুরেন্দ্রনাথ। তাহার কঠিন পীড়া। অথচ গৃহে লোকের অভাব। কে রাত্রি জাগিয়া তাহার শুশ্রূষা করিবে? এজন্য সান্যাল মহাশয় বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। একদিন রাত্রি আটটার সময় তিনি মাথায় হাত দিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীর একেবারে অবসন্ন; কে পুত্রের

কাছে বসিয়া থাকিবে? কেমন করিয়া রাত কাটিবে? কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ঠিক্ সেই সময়েই অন্নপূর্ণা দেবী মূর্ত্তিমতী দয়ার ন্যায় সান্যাল মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তিনি মাতার ন্যায় সমস্ত রজনী সুরেন্দ্রের পাশে বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিলেন। সান্যাল মহাশয় সেই বিপন্ন অবস্থায় অন্নপূর্ণা দেবীর যে করুণাময়ী মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন, সে মূর্ত্তি জীবনে আর বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। বলিতে কি, অন্নপূর্ণা দেবী ও তাঁহার স্বামীর চেষ্টাতেই সুরেন্দ্রনাথ রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিল।

বামাসুন্দরী দেবী নাম্নী একটি হিন্দুমহিলা একখানি চিঠিতে লিখিয়াছেন—"সুশীলার মার মত ভাল মেয়ে আমি আর দেখি নাই। আমি তাঁহার কাছে অনেক উপদেশ ও উপকার পাইয়াছি। আমার সন্তান হওয়ার সময়ে তিনি নিজেই আঁতুড়ঘরে গিয়া আমাকে বাঁচাইয়াছেন। * * হাজার দুঃখকষ্টের সময়ে সুশীলার মার দেখা পাইলে এবং তাঁহার কথা শুনিলে সকল দুঃখ ভুলিয়া যাইতাম। তখন ভাবিতাম, ভগবতী সুশীলার মা-কে না জানি কি দিয়া বানাইয়াছেন।"

এই সংসারে এমন ত কতই দুঃখী ও অসহায় নরনারী রহিয়াছে, যাহাদের উষ্ণ অশ্রুজল কেহ দেখিয়াও দেখে না। যাহাদের মনোবেদনা কেহ বুঝিয়াও বুঝে না। এই শ্রেণীর লোকেরা অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে উপস্থিত হইলে, তাঁহার প্রাণ করুণায় গলিয়া যাইত। তিনি আর কিছু করিতে না পরিলেও তাহাদের দুঃখে অকৃত্রিম সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। এ জগতে অসহায়দিগের মর্ম্মান্তিক দুঃখ ও যন্ত্রণার সময়ে, কেহ যদি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, তাহাতেও যাতনা যেন একটুকু প্রশমিত হয়। দুঃখের বিষয় যে, এই পৃথিবীতে সে রকম লোকের সংখ্যাও অত্যন্ত অল্প। অন্নপূর্ণা দেবীর সংসারের অবস্থা কোন দিনই খুব সচ্ছল ছিল না বটে; কিন্তু কোন দরিদ্র ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাঁহার গৃহদ্বারে উপনীত হইলে, সে আহার না করিয়া ফিরিয়া যাইতে

পারিত না। অতিথিদিগের জন্য তাঁহার গৃহদ্বার ও হৃদয়দ্বার উভয়ই উন্মুক্ত ছিল। তাঁহারা এই ধর্ম্মশীলা নারীর হৃদয়মাধুর্য্যে ও সুমিষ্ট ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন।

একবার মনোমোহন নামক একটি যুবক উন্মাদরোগে আক্রান্ত হইয়া সস্ত্রীক অন্নপূর্ণা দেবীর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবী স্বয়ং সমাদরপূর্ব্বক তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। তাহার পরে তিনি স্বহস্তে মনোমোহনের সেবা করিতে লাগিলেন। বলিতে গেলে, তাঁহার যত্ন, আদর, সেবা ও অকৃত্রিম স্নেহের জন্যই যুবকটি উৎকট পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিল।

রমণী বিলাস-বাসনার অধীন হইয়া আত্মসুখের জন্য স্বামীকে অগ্রাহ্য করিবে—অন্নপূর্ণা দেবী ইহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। নারীর এইরূপ কার্য্যকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। অথচ কোন স্ত্রীলোক ঐরূপ অপরাধ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, তিনি তাহার চোখের জলের সঙ্গে আপনার চোখের জল বিনিময় করিবার জন্যই ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন। একবার তাঁহারই পরিচিত একটি ব্রাহ্মণ কন্যা স্বামীর নিকট অতিশয় গুরুতর অপরাধ করেন। সেই জন্য তাঁহার স্বামী তাঁহাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। স্ত্রীলোকটি আত্মীয় স্বজনের স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়া জ্বালাময় জীবন বহন করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে দুঃখিনী নারী নিরুপায় হইয়া অন্নপূর্ণা দেবীর শরণাপন্ন হইলেন। তিনি বিপন্না রমণীর সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন; তাঁহার অভাব দূর করিবার জন্য তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিলেন; তাঁহার স্বামীর সঙ্গে পুনর্ম্মিলনের জন্য চেষ্টা করিতেও ত্রুটি করিলেন না। কিন্তু হায়, অবশেষে দুর্ভাগিনী সংসারের পিচ্ছল পথে এমন ভাবেই গড়াইয়া পড়িল যে, তাঁহার জন্য অশ্রুপাত করা ভিন্ন অন্নপূর্ণা দেবীর অন্য কিছুই করিবার সুবিধা রহিল না। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত

নৃত্যগোপাল সান্যাল মহাশয় তাঁহার একখানি চিঠিতে লিখিয়াছেন—"তিনি দুই একটি পতিতা রমণীকে ভাল করিবার জন্য আশ্রয় প্রদানও করিয়াছিলেন। তিনি কখনও পাপীকে ঘৃণা করিতেন না, বরং দয়ার ভাবে যাহাতে তাহাদিগকে পাপপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারেন, তাহাদের পতিত জীবন যাহাতে উন্নীত করিতে পারেন, সেজন্য তাহাদিগকে পরামর্শ দিতেন।"

অন্নপূর্ণা দেবীর প্রতিবেশী শ্রীযুক্ত সারদানাথ খাঁ বি, এ একখানি চিঠিতে লিখিয়াছেন—"শোকসন্তপ্ত ব্যক্তি অন্নপূর্ণার সান্ত্বনাবাক্যে শোকের জ্বালা অনেক পরিমাণে বিস্মৃত হইত। তাঁহার সাহায্য প্রাপ্তিতে অনেক দুঃখীলোক দরিদ্রতার হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করিত। তাঁহার ধর্ম্মকথা-শ্রবণে অনেক পাপাসক্ত নরনারী অন্ততঃ সে সময়ে, ভবিষ্যতে ভাল হইবার জন্য সংকল্প করিত। * * তিনি অনেক বার আমার মাতার প্রসবের সময়ে ধাত্রীর কার্য্য করিয়াছেন; সময় সময় সৎগ্রন্থ পাঠের দ্বারা তাঁহার চিত্তবিনোদন করিয়াছেন। * * অন্নপূর্ণা দেবী আমাদের পরিবারের ভবিষ্যতের মঙ্গলের জন্য কতক দিন পর্য্যন্ত প্রতি মাসে আমাদের উদ্বৃত্ত তহবিল আপন হস্তে রাখিয়াছিলেন; এবং যত্ন করিয়া কয়েক শত টাকা সঞ্চয় করিয়া আমাদের হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। অন্নপূর্ণা দেবী দুই তিন বৎসর হইল স্বর্গে গিয়াছেন, কিন্তু তিনি আপন চরিত্রবলে অনেকের অন্তরে এখনও বিরাজ করিতেছেন।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মজীবন ও তাহার প্রভাব

অন্নপূর্ণা দেবী তাঁহার স্বরচিত প্রবন্ধের একটি জায়গায় লিখিয়াছেন—"মনুষ্য ধর্ম্মেতে অনুপ্রাণিত হইতে না পারিলে, ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিলে, আর শান্তি নাই। ঈশ্বরই মনুষ্যের একমাত্র লক্ষ্য। ধর্ম্মই মনুষ্যের জীবন।"

ধর্ম্মশীলা নারীর এই উক্তি গভীর মর্ম্মস্থান হইতে বহির্গত হইয়াছে। তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ধর্ম্মই সংসারের দুর্ল্লভ সামগ্রী। এই ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হইলে, মানুষের জন্মই ব্যর্থ হইয়া যায়। এই ধর্ম্ম ভিন্ন পৃথিবীর কোন সুখই মানুষকে যথার্থ সুখী করিতে পারে না। তাই তিনি বিশ্বাস ও ভক্তি লাভ করিবার জন্যই অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। ঈশ্বরের উপাসনা ও সঙ্গীত তাঁহার অতি স্পৃহণীয় সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অন্নপূর্ণা দেবীর জীবনের যাহা কিছু পবিত্র, যাহা কিছু সুন্দর ও মহৎ তাহা তিনি উপাসনার মধ্য দিয়াই, তাঁহার প্রাণের দেবতা ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই জন্যই আমরা তাঁহার ধর্ম্মজীবনসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

অন্নপূর্ণা স্বীয় প্রকৃতির মধ্যে স্বাভাবিক ধর্ম্মভাব লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার যখন অতি অল্প বয়স, তখনই ধর্ম্মের অনেক সহজ ও সরল ভাব তাঁহার ভিতরে লক্ষ্য করা যাইত। তিনি যখন খুব ছোট মেয়ে, তখনই দেবার্চ্চনার জন্য পুষ্প চয়ন ও পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিতেন। দেব দেবীর অনেকগুলি স্তোত্র তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি প্রত্যহ উহা আবৃত্তি করিতেন। তাহার পরে অন্নপূর্ণা দেবীর শিক্ষার উন্নতি ও জ্ঞানের উন্মেষ হইল। সেই সঙ্গে সঙ্গে নিরাকার অনন্ত-

স্বরূপ ঈশ্বরের প্রতিই তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মিল। তখন তিনি ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য উপাসনা ও প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এ বিষয়ে তিনি তাঁহার স্বামীর নিকট যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায়, পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, পণ্ডিত ভুবনমোহন কর, পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস, মৌনীবাবা প্যারীলাল ঘোষ প্রভৃতি ধার্ম্মিক পুরুষদিগের সঙ্গে তাঁহার সম্মিলিত হইবার সুযোগ উপস্থিত হইল। তিনি এই সকল শ্রেষ্ঠ লোকদিগের উপদেশ শুনিয়া এবং তাঁহাদিগের সহিত উপাসনা ও ধর্ম্মালোচনা করিয়া, ঈশ্বরের নিগূঢ় তত্ত্ব ও মানবাত্মার অনেক রহস্যকথা অবগত হইলেন। তাঁহার জীবন উপাসনা ও প্রার্থনার মধ্য দিয়া ক্রমশঃই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা দেবী ধর্ম্মপথে চলিতে গিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, স্বাভাবিক বৈরাগ্যই ধর্ম্মলাভের একটি শ্রেষ্ঠ উপায়; কারণ, বৈরাগ্য ভিন্ন কে বাসনাকে সংযত করিতে পারে? কে সুখস্পৃহা খর্ব্ব করিয়া ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে সমর্থ হয়? এই সত্য পরিস্ফুট হইয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার অন্তরে বৈরাগ্যের উদয় হইতে লাগিল। তিনি সম্পূর্ণরূপে বিলাসিতা বর্জ্জন করিলেন। গহনা পরিলে পাছে বা তাঁহার মনে বিলাসিতার ভাবই বর্দ্ধিত হয়, সেজন্য তিনি আগেই অঙ্গের আভরণ উন্মোচন করিয়াছিলেন। বাড়ীর মেয়েরা একদিন হঠাৎ চাহিয়া দেখিলেন, অন্নপূর্ণার দুখানি হাত একেবারেই খালি, দুগাছি কাচের চুড়িও নাই। তাঁহারা ত শিহরিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন—"কি সর্ব্বনাশ! এ যে বিধবার মত গায়ের সমস্ত গহনাই খুলিয়া ফেলিয়াছে!"

অন্নপূর্ণা সেই যে অঙ্গের আভরণ উন্মোচন করিয়াছিলেন, আর তাঁহার সমস্ত জীবনে কেহই তাঁহাকে বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার পরিতে দেখে

নাই। একবার মাদলার জমিদার কৃষ্ণেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় অকৃত্রিম স্নেহের চিহ্নস্বরূপ একখানি শাড়ী অন্নপূর্ণা দেবীকে অর্পণ করিয়াছিলেন। পোনের টাকা দামের শাড়ীখানি দেখিতে বড়ই সুন্দর ছিল। কিন্তু এইরূপ মূল্যবান বস্ত্র অন্নপূর্ণা স্বয়ং কিরূপে ব্যবহার করিবেন? তাই তিনি এক মতলব করিয়া জমিদার মহাশয়কে লিখিয়া পাঠাইলেন, "আমি ত অধিক মূল্যের বস্ত্র কখনই ব্যবহার করি না; অথচ আপনার স্নেহউপহার প্রত্যাখ্যান করিতেও পারি না। সেজন্য শাড়ীখানি আমি গ্রহণ করিলাম। কিন্তু উহা কাটিয়া আমার ছেলেদের জামা তৈরী করিয়া দিব। ছেলেরা তাহা ব্যবহার করিলেই আমি অত্যন্ত সুখী হইব।"

অন্নপূর্ণা দেবীর বৈরাগ্যের সঙ্গে সঙ্গেই অন্তরের ধর্ম্মতৃষ্ণা বর্দ্ধিত হইল। ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য তাঁহার মন উন্মনা হইয়া উঠিল। তাঁহার ভক্তিবৃন্তের পুষ্পগুলি প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। তিনি অনুরাগের সহিত উপাসনা, প্রার্থনা, সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এজন্য তাঁহার অন্তরে বিশ্বাস উজ্জ্বল, নির্ভরের শক্তি প্রবল ও সেবার ভাব বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। অন্নপূর্ণা দেবী আপনার গৃহে নব নব ধর্ম্মানুষ্ঠানের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেখানে জীবন্ত উপাসনা, জমাট কীর্ত্তন, গভীর ধর্ম্মালোচনা ও ব্রহ্মোৎসব হইতে লাগিল। নূতন নূতন ধর্ম্মবন্ধু আসিয়া তাঁহার গৃহ পূর্ণ করিয়া তুলিলেন। তিনি আধ্যাত্মিক ভাবের তরঙ্গের মধ্যে পড়িয়া ধর্ম্মোৎসাহে মাতোয়ারা হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অন্তরে নব নব ভাবের স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল।

এই সংসারে স্বভাবতই নারীহৃদয় প্রেমে ও পবিত্রতায় কতই সুন্দর! কিন্তু সেই হৃদয়ে যখন স্বর্গের আলোক নামিয়া আসে, অসীম সুন্দরের প্রকাশ হয়, ভক্তিরস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে; তখন নারীজীবন

কি আশ্চর্য্য সুন্দর! কাহার সাধ্য যে সেই সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে? অন্নপূর্ণা দেবীর আধ্যাত্মিক জীবন নিরীক্ষণ করিয়া অনেকেই আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তাঁহার ধর্ম্মজীবনের কথা চতুর্দ্দিকেই রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। বগুড়া সহরের অনেক উদার প্রকৃতি হিন্দু ও মুসলমান এবং বিদেশের অনেক ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীমন্ত বাবুর গৃহে আসিতে লাগিলেন। এমন কি, পরিব্রাজক, উদাসীন, সন্ন্যাসী, ফকির, ভৈরব, ভৈরবী, বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীগণও তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইতেন। অন্নপূর্ণা দেবীর কোন সম্প্রদায়ের প্রতিই বিদ্বেষ দেখা যায় নাই। তিনি সকল শ্রেণীর ধর্ম্মপিপাসু লোকদিগকেই সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেন। ঐ সকল লোকের সহিত মিলিত হইয়া, উপাসনা, সঙ্গীত ও ধর্ম্মালোচনা করিতে তাঁহার কোনরূপ সংকোচ বোধ হইত না। এজন্য এক এক সময়ে অন্নপূর্ণার গৃহখানি উৎসবমন্দিরে পরিণত হইত। সেখানে জমাট উপাসনা ও কীর্ত্তনের মধ্য দিয়া প্রবল আধ্যাত্মিক ভাবের স্রোত প্রবাহিত হইয়া যাইত।

অন্নপূর্ণা দেবীর প্রতি যখন সকল শ্রেণীর লোকেরই অত্যন্ত শ্রদ্ধা জন্মিল, তখন বগুড়া ব্রাহ্মসমাজের পরিচালকগণ একটি নূতন কার্য্যে ব্রতী হইলেন। তাঁহাদের মনে হইল, এই ভক্তিমতী নারীকে ব্রহ্ম-মন্দিরের আচার্য্যের অধিকার দান করা প্রয়োজন। কারণ অন্নপূর্ণা দেবী স্ত্রীলোক হইলেও আচার্য্যের কার্য্য অতি উৎকৃষ্টরূপেই সম্পন্ন করিতে পারিবেন। তৎপরে বগুড়া ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের একান্ত অনুরোধে অন্নপূর্ণা দেবীকে আচার্য্যের পদ গ্রহণ করিতে হইল। মনস্বিনী নারী ধর্ম্মমন্দিরের পবিত্র বেদীতে বসিয়া উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনেক ভক্ত ও বিশ্বাসী এবং রসলোলুপ উপাসকের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তাঁহারা নারীর সুমিষ্ট উপাসনা ও উপদেশের মধ্যে এক নূতন রসের স্বাদ প্রাপ্ত হইয়া তৃপ্তিলাভ করিতে

লাগিলেন। এই সময়ে বগুড়াপ্রবাসী নৃত্যগোপাল সান্যাল মহাশয় প্রায়ই অন্নপূর্ণা দেবীর উপাসনাতে যোগদান করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"অন্নপূর্ণা প্রকাশ্যভাবে উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। অন্নপূর্ণার উপাসনাতে যাঁহারা অভিনিবেশ সহকারে যোগদান করিয়াছেন, তাঁহারাই তাহার মিষ্টতা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। এ প্রকার সরল বাক্যাড়ম্বর-বর্জ্জিত ভাবময়ী প্রাণস্পর্শী উপাসনায়, এমন ব্যাকুলতাপূর্ণ উচ্ছ্বাসময় প্রার্থনায় যাঁহারা যোগদান করিয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন, তাহাতে কিরূপ লাভবান হইয়াছেন। * * এক্ষণে বগুড়াস্থ সকলেই তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। অন্নপূর্ণার গৃহ সকলের প্রাণ জুড়াইবার স্থান হইল।"

অতঃপর কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ অন্নপূর্ণা দেবীকে একটি উচ্চ অধিকার দান করিলেন। ঐ সমাজের একটি অধ্যক্ষ সভা আছে। সাধারণতঃ সকলের শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিগণই উক্ত সভার সভ্য হইয়া থাকেন। এখন অন্নপূর্ণা দেবীকে সেই অধ্যক্ষসভার সভ্য করা হইল। সেই সময়ের একটি মহিলার পক্ষে ইহা অল্প গৌরবের বিষয় নহে।

কিন্তু হায়, যে অন্নপূর্ণা দেবী পরম আনন্দে, প্রবল উৎসাহে, ঘরের কার্য্য, বাহিরের সেবা, আত্মার উন্নতি ও অপরের কল্যাণের জন্য নানা কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন, তিনিই ঘোর সঙ্কট ও পরীক্ষার মধ্যে পতিত হইলেন। এই জগতে যে স্বামীই তাঁহার সর্ব্বস্ব, যাঁহার উদার ধর্ম্মভাব ও গভীর ভালবাসার জন্য তাঁহার জীবনের এই উন্নতি, হঠাৎ সেই স্বামী উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হইলেন। এক দিকে ত তাঁহার স্বামীর এই কঠিন পীড়া; অন্য দিকে ঘোর দারিদ্র্য। শ্রীমন্ত বাবুর উপার্জ্জন যে খুব কম ছিল, তাহা নহে। কিন্তু উপার্জ্জন বেশি

হইলেই বা কি হইবে। গৃহে অতিথি-অভ্যাগত বিস্তর। খরচ যথেষ্ট। অন্নপূর্ণা দেবীর খোলা হাত। কাজেই তাঁহার অর্থ সঞ্চয়ের সুবিধা হয় নাই। এখন তিনি রুগ্ন স্বামী ও অল্পবয়স্ক পুত্রকন্যাদিগকে লইয়া ঘোর বিপদের মধ্যে পতিত হইলেন। যে-সে স্ত্রীলোক হইলে তরঙ্গের উপরের তৃণখণ্ডের মত দুঃখের আন্দোলনে আন্দোলিত হইয়া বিপদের স্রোতেই ভাসিয়া বেড়াইতেন। কিন্তু অন্নপূর্ণা দেবী অটল ধৈর্য্যের সহিত স্বামীর সেবার জন্য অসাধ্য সাধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সন্তানদিগের প্রতি যে কর্ত্তব্য তাহাও বিস্মৃত হইলেন না। তখন এই বিপন্না নারীর কি সম্বল ছিল? কিসের বলে মনের ধৈর্য্য রক্ষা করিতেন? কাহার কাছে গিয়া হৃদয় জুড়াইতেন? সেই সময়ে অন্নপূর্ণা দেবীকে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন, ঈশ্বরের করুণাই সেই দুঃখিনী নারীর এক মাত্র সম্বল ছিল। তিনি সমস্ত দুঃখকষ্ট ঈশ্বরের "বেদনার দান" বলিয়াই গ্রহণ করিতেন। দৃঢ় বিশ্বাস ও অটল নির্ভরের শক্তিতেই তিনি আপনার চিত্তের শান্তভাব রক্ষা করিতেন। ঈশ্বরের প্রেমের স্পর্শেই তাঁহার তপ্ত হৃদয় জুড়াইয়া যাইত।

অন্নপূর্ণা দেবীর এই সময়ের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার জামাতা ও তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকার বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু বি·এ, লিখিয়াছেন—"ঘোর বিপদে পতিতা ঘোর দারিদ্র্যে-নিমগ্না * * একটি নারী যে অত্যন্ত শোকাভিভূতা হইবেন, তাঁহার প্রাণে যে ঘোর অশান্তির আগুন জ্বলিবে, সহজেই অনুমিত হয়। কিন্তু এখানে কি দেখিলাম? প্রথমেই তাঁহার শান্ত-স্থির-মূর্ত্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। তাঁহাকে দেখিয়া বুঝা যায় না যে, তিনি এই বিপদে পতিতা, বরং ইহা বোধ হয়, তিনি যেন পূর্ব্বাবস্থাতেই আছেন। * * এরূপ জীবন্ত নির্ভর ও বিশ্বাস আর কাহারও জীবনে দেখি নাই। তাঁহার

সহিষ্ণুতার তুলনা হয় না। * * তাঁহার ধর্ম্মজীবন দেখিলে মোহিত না হইয়া থাকা যায় না। তাঁহার নিকটে গেলেই সে জীবনের শক্তি অনুভব করা যাইত।"

নব্যভারত সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় অন্নপূর্ণা দেবীর সেই সঙ্কটের সময়ের অবস্থা দর্শন করিয়া একখানি চিঠিতে লিখিয়াছেন—"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বিপদে পড়িয়াছেন মায়ের উপর নির্ভর করুন, আর উপায় নাই। কিছু চিন্তা করিবেন না। দেবীর মুখ আরো প্রসন্ন হইল, * * তিনি বলিলেন, "আমি একদিনও চিন্তা করি না—ভাবিব কেন? যাঁহার পরিবার তিনিই রক্ষা করিবেন। তাঁহার ইচ্ছা হয়, নয় ভাসিয়াই যাইব, চিন্তা বা দুঃখ কি? এইরূপ ঘোর বিপদে এইরূপ কথা শুনিয়া আমি মোহিত হইলাম। তাঁহাকে প্রণাম করিতে ইচ্ছা হইল। তিনি কি ভাবিবেন ভাবিয়া অতি কষ্টে ভাব সংবরণ করিলাম। আরও অনেক কথা হইল, সে সকলই উজ্জ্বল বিশ্বাসের পরিচায়ক, আমি এমন বিশ্বাসী ব্রহ্মকন্যা জীবনে আর দেখি নাই।"

খাঁটি সোণা আগুনের মধ্যে পড়িলেই উজ্জ্বল হইয়া উঠে। অন্নপূর্ণা দেবী বিপদ ও পরীক্ষার মধ্যে পড়িয়াই আধ্যাত্মিক জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন।

এই দুর্ঘটনার পূর্ব্বেই অন্নপূর্ণা দেবীর উন্নত জীবন দেখিয়া, তাঁহার উপরে লোকের যে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, আমরা নানা স্থানেই সেই কথার উল্লেখ করিয়াছি। আমরা বলিয়াছি, অনেকে উত্তপ্ত প্রাণের জ্বালা জুড়াইবার জন্য তাঁহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। কিন্তু তিনি কোন রকম তন্ত্রমন্ত্রই জানিতেন না, তাঁহার কোন অলৌকিক শক্তিও ছিল না; এই কল্যাণময়ী নারী শুধুই বিশ্বাসে অন্তর পূর্ণ করিয়া, হৃদয়পাত্র স্নেহ-সুধায় ভরিয়া, আবেগভরা প্রাণে

সুমিষ্ট ধর্ম্মকথা বলিতেন, মানুষের চিত্ত ভাবরসে সিক্ত করিয়া তুলিতেন, মনের মধ্যে ঈশ্বরের করুণার কথাটাই জাগাইয়া দিতেন, তাহাতেই শান্তিহারা নরনারীর হৃদয়ের জ্বালা দূর হইত, প্রাণ জুড়াইয়া যাইত। এ বিষয়ে দুই একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি।

শ্রীমন্ত বাবুর সুপরিচিত মহেশচন্দ্র সেন মহাশয় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি অনেক দিন হইতেই অন্নপূর্ণা দেবীকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার দুইটি সন্তানের মৃত্যু হইল। তখন মহেশ বাবুর পত্নী শোকের জ্বালায় অস্থির হইয়া জুড়াইবার জন্য অন্নপূর্ণা দেবীর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি শোকার্ত্তা নারীর মন সংসার হইতে ঈশ্বরের দিকে ফিরাইয়া দিলেন। তাহাতেই সেই সন্তানহারা জননীর শোক একটুকু প্রশমিত হইল। ধীরে ধীরে তাঁহার দুর্ব্বল ও অবসন্ন প্রাণ সবল হইয়া উঠিল।

অন্নপূর্ণা দেবীর মৃত্যুর পরে বগুড়ার মডেল স্কুলের পণ্ডিত শ্রীনাথ দে, শিববাটীর শ্রীযুক্ত গিরিগোপাল রায় প্রভৃতি অনেক লোকই প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহারা সংসার-জ্বালায় উত্তপ্ত হইয়া শান্তিলাভের আশায় অন্নপূর্ণার গৃহেই গমন করিতেন। তাঁহার সুমধুর সান্ত্বনাবাক্যে ও উপাসনাতে তাঁহাদের হৃদয় জুড়াইয়া যাইত। অন্নপূর্ণা দেবীর জীবন যে কি উন্নত, তাঁহার ধর্ম্মভাব যে কিরূপ অকৃত্রিম, তাঁহার হৃদয় যে কি রকম উদার এবং সেই হৃদয়ের শক্তি যে কত অধিক, তাহা আমরা এই সকল ঘটনার দ্বারা উত্তমরূপেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছি।

বিধাতা তাঁহার এই প্রিয় কন্যাকে যে কার্য্যের জন্য সংসারে পাঠাইয়াছিলেন, বুঝি বা তাহা শেষ হইয়া গেল। সেজন্য পতিব্রতা ও ধর্ম্মশীলা নারীর পৃথিবী হইতে প্রস্থানের দিন নিকট হইয়া আসিল। তিনি রোগের আক্রমণে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শরীর শীর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু এই সময়েই তাঁহার জীবনের জ্যোতি উজ্জ্বল হইয়া

উঠিল, অন্তরের ভক্তি বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িল। ধর্ম্মপ্রাণা নারী রুগ্নাবস্থায় সংসার ভুলিয়া স্বর্গের দেবতার চরণেই আত্মসমর্পণ করিলেন; তিনি পৃথিবীর স্বামীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, তাঁহার চিরবাঞ্ছিত ঈশ্বরের অক্ষয় প্রেমের মধ্যে ডুবিবার জন্য মনকে প্রস্তুত করিলেন।

অন্নপূর্ণা দেবীর সঙ্কটাপন্ন পীড়ার সময়ে তাঁহার প্রিয় ব্রহ্মোৎসব আসিয়া পড়িল। তিনি বিদেশের বন্ধুদিগকে উৎসবে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। এবার বিশেষ ভাবেই উৎসবের আয়োজন হইল। দিনাজপুরের চিরকুমার-ব্রত-ধারী পরম ভক্ত ও দরিদ্র-সেবক পণ্ডিত ভুবনমোহন কর, সাধনপরায়ণ মৌনীবাবা অর্থাৎ প্যারীলাল ঘোষ, জলপাইগুড়ির বিশ্বাসী ও ভক্ত জালালুদ্দিন মিয়া প্রভৃতি ব্রাহ্মবন্ধুগণ বগুড়াতে উপস্থিত হইলেন; একজন সন্ন্যাসী ও ধার্ম্মিক ফকির আসিয়া অন্নপূর্ণা দেবীর উৎসাহ বর্দ্ধিত করিলেন। দিবারাত্রি উপাসনা, সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন হইতে লাগিল। ভাবোচ্ছ্বাসে ও ভক্তির তরঙ্গে উৎসবগৃহ পূর্ণ হইয়া উঠিল। ধর্ম্মপিপাসু নরনারীর মনের আনন্দ হৃদয়ের দুই কূল ছাপাইয়া পড়িল। অন্নপূর্ণা দেবী এই মহোৎসবের মধ্যে পবিত্র গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিলেন। তাঁহার যোগিনীমূর্ত্তি ও ভক্তিবিমণ্ডিত বিমল মুখশ্রী দর্শন করিয়া যথার্থই তাঁহাকে দেবী বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তাঁহার সেই সময়ের গভীর আধ্যাত্মিক ভাব নিরীক্ষণ করিয়া ভক্তদিগের অন্তরে বিস্ময় ও পুলক জাগ্রত হইল। সেই দিন অন্নপূর্ণা দেবী সমস্ত সময় উপাসনা ও ধ্যান ধারণাতেই অতিবাহিত করিলেন।

এই উৎসব সম্বন্ধে অন্নপূর্ণা দেবীর স্বামী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—" * * অন্যদিকে অপর সন্ন্যাসী সঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত হইয়া এক এক বার ধূলিতে অবলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। আবার চেতনা পাইয়া হুঙ্কার দিয়া উন্মত্ত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন জমাট করিয়া তুলিতে

লাগিলেন। অপর দিকে ভুবন বাবুর সুমধুর ভক্তিপূর্ণ উপাসনা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত এক এক বার সকলকে প্রশান্ত ও গম্ভীর করিতে লাগিল। অন্য সময়ে প্যারীলাল বাবুর চিন্তাপূর্ণ ও সারবান্ বক্তৃতায় সকলকে প্রোৎসাহিত করিয়া তুলিল। * * অবিরত ধর্ম্মের উচ্ছ্বাস ও তরঙ্গে সমস্ত গৃহ তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। উপস্থিত বন্ধুমণ্ডলী পর্য্যন্ত ভাবে মত্ত হইয়া উঠিলেন। এইরূপে ১লা বৈশাখ হইতে ১০ই পর্য্যন্ত উৎসব চলিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরলোকে প্রস্থান

অন্নপূর্ণা দেবীর আড়াই কি তিন বৎসর পূর্ব্বে পীড়ার সূচনা হইয়াছে; এখন সেই পীড়াই এমন কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, বাঁচিবার আশা নাই। মৃত্যুর কৃষ্ণবর্ণ ছায়া তাঁহার শীর্ণ দেহখানির উপরে পতিত হইয়াছে; পরলোক-যাত্রার দিন নিকট হইয়া আসিয়াছে। তাই তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য নানা সম্প্রদায়ের বন্ধু ও আত্মীয়গণ তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। রোগিণীর সঙ্কটাপন্ন অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া সকলেরই মুখ বিষণ্ণ ও ম্লান হইয়া পড়িল। হায়, তাঁহারা এতদিন যে ধর্ম্মশীলা নারীর সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করিয়া কতই উপকার প্রাপ্ত হইতেন, যাঁহার প্রাণস্পর্শী উপাসনায় যোগদান করিয়া কতই তৃপ্তিলাভ করিতেন, যাঁহার সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহাদের উত্তপ্ত প্রাণ জুড়াইয়া যাইত; সেই ঈশ্বরের প্রিয় কন্যাকে আর এই দৃশ্যজগতে ধরিয়া রাখা যাইবে না। তিনি অদৃশ্য রহস্যলোকের দিকেই যাত্রা করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে অন্নপূর্ণা দেবীর পরলোকযাত্রার দিনটি

আসিয়া উপস্থিত হইল। সেদিন পতিব্রতা নারী তাঁহার স্বামীকে কহিলেন—"তুমি একটু সময়ের জন্যও আমার নিকট হইতে দূরে যাইও না।"

স্বামী জীবনসঙ্গিনীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া ম্লানমুখে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে অন্নপূর্ণা দেবী একবার বলিলেন,

"আমাকে ডাকে।"

স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে ডাকে?"

অন্নপূর্ণা কহিলেন—"ঈশ্বর।"

ইহাই পুণ্যবতী নারীর অন্তিম সময়ের শেষ কথা। হায়, যে মধুর কণ্ঠের মর্ম্মস্পর্শী ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য শ্রীমন্ত বাবুর গৃহে বহু লোকের সমাগম হইত, সেই কণ্ঠই আজ চিরদিনের জন্য নীরব হইয়া গেল।

শ্রীমন্ত বাবু সহধর্ম্মিণীর মৃত্যুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—" * * ডাক্তার সাহেব ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিয়া বিষাদপূর্ণহৃদয়ে বিদায় হইবার কালে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আজ রোগীর অবস্থা কেমন বোধ করিতেছেন? আমি বলিলাম, আজকার অবস্থা দেখিয়া আর জীবনের আশা করিতে পারি না।" তাঁহারাও বিষাদ-পূর্ণ-হৃদয়ে আমার বাক্য সমর্থন করিয়াই বিদায় হইলেন। এই অবস্থায় সত্বর সূর্য্য অস্তমিত হইল; পূর্ণচন্দ্র যেন ধবল অমৃতময় কিরণ বিস্তার করিয়া অন্নপূর্ণার পরলোকযাত্রার প্রতীক্ষায় তাঁহার কল্যাণের জন্য বার বার ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। * * আমি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বরাবর বসিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে-ছিলাম। হঠাৎ কার্য্যের জন্য গৃহমধ্যে পাঁচ ছয় হাত অন্তরে যাওয়া মাত্র যেন অন্নপূর্ণা আমার অন্তরে প্রবেশ করিয়া আমাকে বলিতে লাগিলেন যে—

"আমি তোমার অন্তরে আসিয়াছি। বিভিন্ন দেহ এইক্ষণেই আমি পরিত্যাগ করিলাম।"

"আমি এই অন্তর্বাণী শুনিবামাত্র চমকিতভাবে তাঁহার পার্শ্বে যাইয়া হার্ট পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, দেহে প্রাণের কোন লক্ষণই নাই। তৎক্ষণাৎ আমি সকল বন্ধুকে জানাইলাম যে, এই মাত্র অন্নপূর্ণা পরলোকে গমন করিলেন।"

অন্নপূর্ণা দেবীর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া কত পুরুষ ও নারী যে দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহা আর কি বর্ণনা করিব? আমি জানি না, এই বাংলা দেশে কয়টি মহিলার মৃত্যুতে সকল সম্প্রদায়ের লোক এইরূপ ব্যথিতঅন্তরে দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অন্নপূর্ণা দেবীর সম্বন্ধে তাঁহার প্রতিবাসী ব্রাহ্মণ সারদানাথ খাঁ বি-এ, লিখিয়াছেন—

"তাহাতে এমন কিছু ছিল, যাহা অদৃশ্য হইলেও চুম্বকের ন্যায় লোকের মনের উপর কার্য্য করিত।"

ঠিক্ কথা! এই একটি বাক্যের দ্বারাই অন্নপূর্ণা দেবীর জীবনের রহস্য একটুকু প্রকাশ করা হইয়াছে। তিনি এ দেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরের মেয়ে হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; পাছে বা তাঁহাকে স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে, প্রকাশ্য স্থানে বাহির হইতে, উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করিতে এবং নূতন আলোকে সমাজের পথে চলিতে দেখিয়া লোকেরা তাঁহার নিন্দা করে, তাই স্বয়ং ঈশ্বরই তাঁহার এই সেবিকা কন্যার জীবনে এমন এক রহস্যময় ভাব ফুটাইয়া তুলিলেন, যাঁহার আকর্ষণে হিন্দু, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম ও মুসলমান, পুরুষ ও নারী সকলেই আকৃষ্ট হইলেন, তাঁহার সমাজবিরোধী ভাব দর্শন করিয়া কাহারও নিন্দা করিবার প্রবৃত্তি জাগ্রত হইল না। যে মুসলমান ভদ্রলোকেরা স্ত্রী-স্বাধীনতার ঘোর বিরোধী ছিলেন, তাঁহাদেরই মৌলবি আবদুল রহিম অন্নপূর্ণাকে আত্মীয়ার মত মনে করিতেন এবং তাঁহার সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা

কহিয়া শ্রদ্ধায় পূর্ণ হইয়া উঠিতেন। বগুড়ার সম্ভ্রান্ত জমিদার শ্রীযুক্ত সৈয়দ আলী মিয়া অন্নপূর্ণাকে "নারীকুলের মণিস্বরূপা" বলিয়া মনে করিতেন। * এই সকল বিষয়ে আমার এই ক্ষুদ্র রচনাটির মধ্যে আর অধিক বর্ণনা করিবার স্থান নাই। আমি শুধু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বয়োবৃদ্ধ এবং ব্রাহ্মদিগের পরম শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়ের একখানি চিঠির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া এই রচনাটি সমাপ্ত করিব। তিনি লিখিয়াছেন—

"তাহার জীবনের যে মাধুর্য্য দেখিয়াছি, তাহা আজও ভুলিতে পারি নাই। * * তাঁহাকে যেমন উপাসনাতে তেমন ধর্ম্মচর্চ্চাতে অনুরক্তা দেখিয়াছি। তেমনি যাহা কুসংস্কার বলিয়া বুঝিতেন, তাহারা সংস্কারের জন্য খুব উৎসাহী দেখিয়াছি। জ্বলন্ত ধর্ম্মবিশ্বাসই এরূপ আচরণের মূল। তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞানও বেশ উজ্জ্বল ছিল, ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধেও তাহার বেশ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। নিজযত্নে অতি অল্প লোকেই সেরূপ জ্ঞানার্জ্জন করিতে পারে। তাঁহার গৃহে যিনি কিঞ্চিৎ কাল বাস করিয়াছেন, তিনি ছাড়িবার সময় একটা বিচ্ছেদের ক্লেশ অনুভব করিতেন। সকলকেই একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিতে শুনিয়াছি, সকল শ্রেণীর লোকের প্রিয়পাত্রী হওয়া খুব সহজ কথা নয়। তাঁহার অমায়িকতা, সরলতা এবং ভদ্রতাতে সকলেই প্রীত হইতেন। এ সময়ের প্রধান রোগ বিলাসিতা। তাঁহার জীবনে বিলাসিতার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। তাঁহার প্রশংসা আমি আর কি করিব? তাঁহার প্রশংসা চরিত্রই ঘোষণা করিতেছে, এইরূপ চরিত্রই মানবচরিত্র-গঠনের সহায়তা করে।"

সম্পূর্ণ।

---

* "অন্নপূর্ণাচরিত" লেখকের বর্ণনা দেখুন।